ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ■ মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩০

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

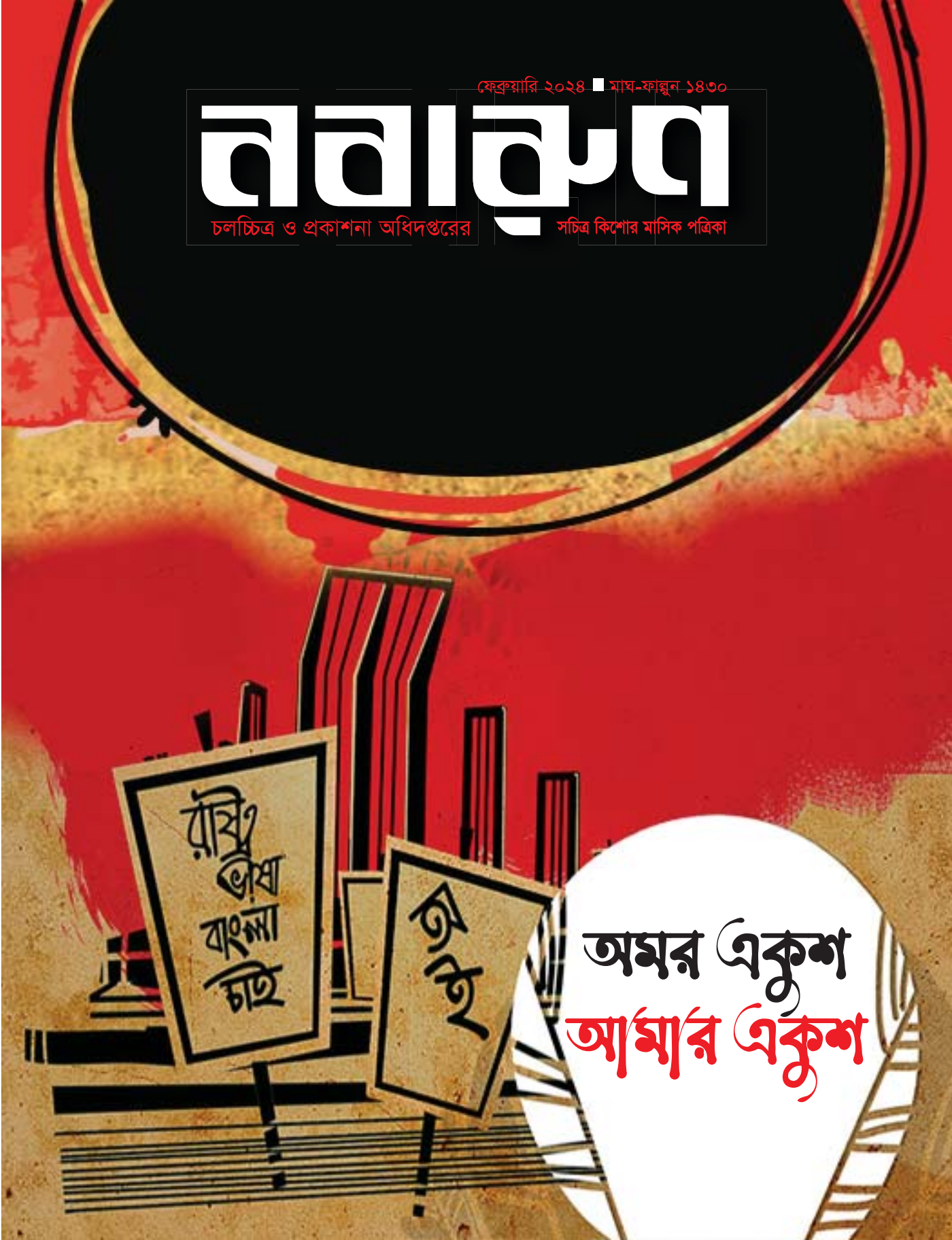

আয়ান হক, চতুর্থ শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

আমিমুল ইসলাম, তৃতীয় শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

সম্পাদকীয়

ফেব্রুয়ারি এলেই সবার মনে বেজে ওঠে এই গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'? বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যে বাংলা ভাষা ঘিরে, আমার মায়ের ভাষা বাংলা। সেই ভাষার ওপর যখন আঘাত এল, তখন বুকের রক্তে লেখা হলো নতুন ইতিহাস। আমরা কোনোদিনই ভুলব না ১৯৫২ সালের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারির কথা। ভাষার দাবিতে রাজপথে রক্ত দিয়েছিল সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বার, শফিউর। জ্বলে ওঠা আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির পথ ধরেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি গড়ে তুলেছিল গণঅভ্যুত্থান, স্বাধিকার আন্দোলন এবং সবশেষে ১৯৭১-এর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। আমরা পেলাম স্বাধীনতা।

১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। একুশে ফেব্রুয়ারি এখন বিশ্বব্যাপী পালন করা হয়। এ দিনটি বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল ও স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন।

স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে মাতৃভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখা আমাদের দায়িত্ব। বিশ্বসভায় বাংলা ভাষার মর্যাদা যেন আরো বৃদ্ধি পায়, এ ব্যাপারে খুব সচেষ্ট থেকো বন্ধুরা। ভাষা শহিদদের স্বপ্ন পূরণ হবে এভাবেই। তাহলেই তাদের রক্তঋণ শোধ করা হবে।

ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য সীমাহীন। এ কারণে ফেব্রুয়ারি এলেই দেশজুড়ে শুরু হয় নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। শহিদদের স্মরণে বাংলা একাডেমি মাসব্যাপী আয়োজন করে অমর একুশে বইমেলা। এবারের বইমেলার প্রতিপাদ্য হচ্ছে- 'পড়ো বই গড়ো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'। অন্য বছরের মতো এবারও চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের স্টল রয়েছে বইমেলায়। অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রকাশনার পাশাপাশি রঙিন নবারুণে তোমাদেরকে স্বাগত।

বইমেলার 'শিশু চত্বর' উপচে পড়ুক তোমাদের উপস্থিতিতে, তোমাদের হাতে শোভা পাক নতুন নতুন বই, তোমরা সেই বইগুলোর গন্ধ নাও মন ভরে, বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তোমাদেরকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলুক। ভালো থেকো বন্ধুরা। তোমাদের জন্য শুভকামনা নিরন্তর।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সূচি

নিবন্ধ

০৩ অমর একুশ আমার একুশ/রফিকুর রশীদ
২১ ভাষা আন্দোলনের সূতিকাগার/ নাসীমুল বারী
৪৫ বিভিন্ন ভাষায় অসমাপ্ত আত্মজীবনী/ রুবাইয়াত ইসলাম
৪৭ ইশারা ভাষার কথা/ মো. জোবায়ের হোসেন
৪৯ ভাষা বাঁচানোর লড়াই/ আব্দুছ ছালাম
৫০ দৃষ্টিনন্দন স্কুল/ আতিকুর রহমান

গল্প

৮ সৌরভে গৌরবে চেতনায় একুশ/ অনুপম হায়াৎ
১১ শিমুল-পলাশের গর্ব/ সুজন বড়ুয়া
১৭ টিকাইয়ের একুশ/ বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী
২৭ দোয়েল কেন করবে কা কা/ আহমেদ রিয়াজ
৩০ পাখিদেরও ভাষা আছে/ মুহিবুল্লাহ কাফি
৩৫ একুশের গান/ রুমান হাফিজ
৩৯ শহিদমিনারে সুচি/ শাম্মী তুলতুল

সাফল্য প্রতিবেদন

৫২ শিশুকে খাওয়ানোর নিয়ম/ মো. জামাল উদ্দিন
৫৪ পিলার তো নয় যেন ক্যানভাস/ তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
৫৫ নারী ফুটবলে যৌথ চ্যাম্পিয়ন/ মেজবাউল হক
৫৬ এভারেস্টের বেজক্যাম্পে শিশু/ জান্নাতে রোজী
৫৭ ভাত খেয়ে বিশ্বরেকর্ড/ শাহানা আফরোজ
৫৮ ভ্যান গাড়িতে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার/ আরিফুল ইসলাম
৫৯ দশ দিগন্ত/ সাদিয়া ইফফাত আঁখি
৬১ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

কবিতাগুচ্ছ

১০ শাহজাহান মোহাম্মদ
১৫ বিচিত্র কুমার/ শচীন্দ্রনাথ গাইন
১৬ মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ/ রানাকুমার সিংহ
২৫ বিজন বেপারী/ জাহিদ বিন হিকমত
২৬ পরিতোষ বাবলু/ মুহাম্মদ ইসমাঈল
৩৭ অমিত কুমার কুণ্ডু
৩৮ এম ইব্রাহীম মিজি/দেওয়ান বাদল/নাছরিন জাহান রূপা
৪১ শাহীন খান

ছোটোদের লেখা

৪২ আমাদের মুখের ভাষা/ ফাতেমা জান্নাত

ছোটোদের ছড়া

১৬ সিনথিয়া জালাল
২০ মো. মুশফিকুর রহমান মিদুল
২৫ মানতাকা তাবাস্‌সুম গুড়িয়া
৩৭ শাকিলা ইয়াসমিন
৩৮ মো. সাকিবুল ইসলাম

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : আয়ান হক/ আমিমুল ইসলাম
১৪ নাজিবা নাওয়াল
৩৪ মির্জা মাহের আসেফ
৪৪ মালিহা তাবাস্‌সুম
৪৬ ত্বকী তাহমিদ রিহিন
৪৮ রাহি সরকার রুহী
৫১ তাসনিম জাহান রাদিয়া
৬৩ জুনাইরা জাহিন/ জারিন আক্তার
৬৪ স্নেহা চৌধুরী/ উপমা দও তরী

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (*Nobarun Potrika*) আপলোড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট *www.dfp.gov.bd*-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

অমর একুশ আমার একুশ

রফিকুর রশীদ

একুশ একটি গাণিতিক সংখ্যা। বাঙালি জাতির কাছে একুশ শব্দটির ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য অনেক ব্যাপক ও গভীর। মহান ভাষা আন্দোলনের বুকের গভীর থেকে উঠে এসেছে এই একুশ। তাই গোড়াতেই আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হয় ভাষার লড়াই তথা ভাষা আন্দোলনের দিকে। কাকে বলে ভাষা আন্দোলন। ভাষার জন্য যে আন্দোলন, খুব সহজে তাকেই বলে ভাষা আন্দোলন। মাতৃভাষার জন্য হতে পারে সে আন্দোলন, হতে পারে রাষ্ট্রভাষা কিংবা জাতীয় ভাষার জন্যও। আমাদের ভাষা আন্দোলন ছিল মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদার জন্য রক্তক্ষয়ী আন্দোলন। এ আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে। সেই থেকে ক্যালেন্ডারের পাতায় বন্দি 'একুশ' পেয়ে যায় প্রতীকী মর্যাদা, হয়ে ওঠে বাঙালির অবিনাশী চেতনার অন্য নাম। ভাষা শহিদদের বুকের রক্তে সে আন্দোলন সফল হয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় বাঙালি জাতি পৌঁছে যায় মহান মুক্তিযুদ্ধে। একুশের প্রেরণা ও উদ্দীপনা থেকেই বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন।

বাঙালিকে বাংলা ভাষা থেকে সরিয়ে দেওয়ার নানামুখি চক্রান্ত চলতেই থাকে। বিক্ষুব্ধ বাঙালির রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন কিন্তু মোটেই স্তিমিত হয় না। পূর্ববঙ্গ আইনসভার বাজেট অধিবেশন ছিল ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। কাজী গোলাম মাহবুবের নেতৃত্বে গঠিত সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ওই তারিখকে রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালনের আহ্বান জানায় এবং হরতাল আহ্বান করে

ছোট্ট বন্ধুরা, ভাষা আন্দোলন থেকেই আপন ঠিকানায় বাঙালির যাত্রা শুরু বলে হয়ত তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে–ভাষার জন্য আন্দোলন কেন? ভাষা তো এমনিতেই পাওয়া যায়। মায়ের মুখ থেকে শুনে শুনেই শেখা হয়ে যায়। তার নাম মাতৃভাষা। সবারই থাকে মাতৃভাষা। মানুষের তো বটেই, পশুপাখিরও আছে মাতৃভাষা। মাতৃভাষাতেই সম্ভব মনের ভাব সহজে প্রকাশ করা। কথা বলা, গান গাওয়া, নাটক করা, স্বপ্ন দেখা, চিন্তা করা, কল্পনা করা, নতুন কিছু শেখা– সবকিছুতেই মাতৃভাষার প্রয়োজন সবার আগে। মাতৃভাষা ছাড়া তো জীবন প্রায় অচল।

হ্যাঁ বন্ধুরা, বাঙালি জাতিকে এ আন্দোলন করতে হয়েছে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই। ৪৭-এর দেশভাগের পর বাঙালির রাষ্ট্রীয় পরিচয় বদলে যায়। পূর্ববঙ্গ হয় পূর্ব পাকিস্তান(১৯৫৫ সালে এসে), পাকিস্তান নামের নতুন রাষ্ট্রের অংশ। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে হাজার মাইলের ব্যবধান, দুই অংশের মানুষের ভাষা-খাদ্য-পোশাক-আচার-আচরণ-সংস্কৃতি সবকিছুই (ধর্মীয় পরিচয় ছাড়া) প্রায় আলাদা। তবু পাকিস্তানের জনগণ রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা পাবে, নতুন রাষ্ট্রের কাছে এটাই ছিল প্রত্যাশা। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি শুরু থেকেই জনগণের এই প্রত্যাশা ও স্বপ্নের কথা মানতে চায়নি। জনগণের মতামতের তোয়াক্কা করেনি মোটেই। সব সিদ্ধান্ত তারা উপর থেকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পরপরই রাষ্ট্রভাষা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। নতুন এই রাষ্ট্রে বাস করে অনেক রকম ভাষার মানুষ। তখনকার সময় সাড়ে ছয় কোটি মানুষের মধ্যে চার কোটিরও অধিক মানুষ ছিল বাংলাভাষী।

অবশিষ্ট দু'আড়াই কোটি মানুষের ভাষা ছিল বেলুচ, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, পশতু প্রভৃতি। তাহলে রাষ্ট্রের অফিস-আদালতসহ সব রকমের সরকারি কাজকর্ম চলবে কোন ভাষায়?রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ যে ভাষা সহজে বোঝে, যে ভাষার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের সব কাজ সমাধান করে, সেটাই তো হওয়া উচিত রাষ্ট্রভাষা। একটি না হয়ে একাধিক ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর অনেক দেশে সে রকম আছেও। তবে পাকিস্তানের অধিক মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেটাকেই তো অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে। কিন্তু সেটা যে বাংলা ভাষা। এ ভাষার আছে গর্বিত বর্ণমালা, আছে মানবিক আবেগমথিত সাহিত্যকর্ম, আছে মরমী সঙ্গীতভাণ্ডার, আছে হাজার বছরের ঐতিহ্য। শুধু সংখ্যাধিক্যের জোরেই নয়, এ ভাষার মর্যাদার দাবি তো উঠতে পারে নানান বিবেচনাতেই। কিন্তু পাকিস্তানের কর্তারা ন্যায়নীতিবোধ ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র উর্দু ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চাইল। তখন উর্দুর পাশে বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবি ওঠে,

এই দাবিতে এ দেশের রাজনীতিবিদ এবং ছাত্রসমাজ গড়ে তোলে প্রবল আন্দোলন। এই আন্দোলনের নাম হয় ভাষা আন্দোলন বা রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন।

এ আন্দোলনের ধারাবাহিক এবং বর্ণাঢ্য ইতিহাস আছে। গৌরবময় সেই ইতিহাস সবারই জানা দরকার। পূর্বপুরুষের বীরত্বপূর্ণ কীর্তিগাথার সঙ্গে উত্তরপুরুষের

পরিচয় যদি নিবিড় এবং আন্তরিকতাপূর্ণ না হয়, তাহলে বহু পূর্বে ঘটে যাওয়া গৌরবদীপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে নিজেকে যোগসূত্র করবে কী করে উত্তরপুরুষ? সেই গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত ভাববেই বা কেমন করে? আর পূর্বপুরুষের কাছে উত্তরপুরুষের যে ঋণ সে ঋণ যদি কেউ উপলব্ধি না করে তাহলে তো ঋণ শোধের কোনো দায়-ই বোধ করবে না। দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা, মানুষের মুখের ভাষার গৌরবময় আন্দোলনের কথা সঠিকভাবে না জানলে তুমি-আমি বাঙালি পরিচয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো কেমন করে?

ছোট্ট বন্ধুরা, 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল' -- এই প্রবাদটির মানে জানো তোমরা? পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই ড. জিয়াউদ্দীনসহ (আলিগড়) একদল বুদ্ধিজীবী ঘোষণা করেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। একেই বলে আগাম প্রস্তুতি। অবশ্য ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবিই অগ্রগণ্য বলে জানিয়ে দেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের জনক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ শুধুমাত্র উর্দুর পক্ষে তাঁর অবস্থান ঘোষণা করলে তাকে সমর্থন করার জন্য দালাল- বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদের অভাব হলো না। এমনকি বাঙালি হয়েও বেশ কিছু মতলববাজ পণ্ডিত ও নেতা জুটে যায় তাদের দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) বাঙালি ছাত্র-জনতা-রাজনীতিবিদ অন্যায্য এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে এবং দেশজুড়ে গড়ে তোলে বিশাল ঐক্য এবং শক্তিশালী আন্দোলন। এ আন্দোলন হয়ে ওঠে বাঙালির আত্মজাগরণের পথে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন।

পাকিস্তান জন্মের পূর্বেই পাকিস্তানের সম্ভাব্য রাষ্ট্রভাষা নিয়ে যে অশুভ বিতর্কের সূচনা হয়, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তা পূর্ববঙ্গের (১৯৫৫ সালে নতুন নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান) ছাত্র-জনতার সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রবল গণআন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই

ভাষা শহিদদের স্মরণে রাজপথেই মোনাজাতে শরিক হয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সতীর্থরা, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩

সেপ্টেম্বর অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে তমুদ্দুন মজলিস 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু না বাংলা নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। সরকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় থেকে এবং মুদ্রা ও ডাকটিকেট থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দিলে ঢাকার ছাত্রসমাজ ডিসেম্বরের ৮ তারিখে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে করাচিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান জোর উদ্যোগ নেন। তার এই তৎপরতায় ক্ষুব্ধ পূর্ববঙ্গবাসী। তমুদ্দুনের নূরুল হক ভূঁইয়ার নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ।

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলার দাবি তুললে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের প্রবল বিরোধিতায় তা নাকচ হয়ে যায়। এ খবরে ঢাকার ছাত্রসমাজ ২৬শে ফেব্রুয়ারি ক্লাস বর্জন করে এবং ২৯শে ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালন করে। মার্চের ২ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে শামসুল হকের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সেখান থেকে ১১ই মার্চ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। এদিন আন্দোলনকারীদের মধ্যে গ্রেফতার হন শামসুল হক, অলি আহমদ, শওকত আলী, শেখ মুজিব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে এবং পুলিশি নির্যাতন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১২ থেকে ১৫ই মার্চ পালিত হয় ধর্মঘট। তীব্র আন্দোলনের মুখে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৫ই মার্চ ১৯৪৮ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পাকিস্তানের স্থপতি জিন্নাহ ১৯শে মার্চ ঢাকা এসে ২১শে মার্চ রেসকোর্সে এবং ২৪শে মার্চ কার্জন হলের ভাষণে স্পষ্ট ঘোষণা করেন, শুধুমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। আবার ২৭শে নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানও বাংলা ভাষার দাবি প্রত্যাখ্যান করে উর্দুর পক্ষে তার অবস্থান জানিয়ে দেন এবং আন্দোলন দমনের ঘোষণা করেন।

এদিকে সরকারের পক্ষ থেকে আরবি হরফে বাংলা লেখা প্রচলনের প্রচেষ্টা হয়, বিকল্প হিসেবে রোমান হরফের কথাও বলা হয়। বাঙালিকে বাংলা ভাষা থেকে সরিয়ে দেওয়ার নানামুখি চক্রান্ত চলতেই থাকে। বিক্ষুব্ধ বাঙালির রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন কিন্তু মোটেই স্তিমিত হয় না। পূর্ববঙ্গ আইনসভার বাজেট অধিবেশন ছিল ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। কাজী গোলাম মাহবুবের নেতৃত্বে গঠিত সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ওই তারিখকে রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালনের আহ্বান জানায় এবং হরতাল আহ্বান করে। সরকার এ আন্দোলনকে দমন করার জন্য ২০শে ফেব্রুয়ারি থেকে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা আইন জারি করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা তা মানবে কেন? তারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ২১ তারিখে আইন পরিষদের দিকে এগিয়ে গেলে পুলিশ গুলি চালায়। শহিদ হয় জব্বার, রফিক, সালাম ও বরকত। এ খবরে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে গণআন্দোলন, বিক্ষোভ আর মিছিল। গায়েবানা জানাজাতেও হামলা চালায় পুলিশ। ২২ তারিখে শহিদ হয় শফিউর রহমান, আব্দুল আউয়াল এবং ওহিউল্লা। তবে ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখকেই ভাষা-আন্দোলনের সর্বোচ্চ শিখরস্পর্শী দিন বিবেচনা করা হয়। বলা হয় অমর একুশ, অবিনাশী একুশ। এদিন থেকে একুশ আর গাণিতিক সংখ্যামাত্র থাকে না বাঙালির কাছে। অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনা বিনির্মাণের বাতিঘর হয়ে ওঠে।

ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালের ৭ই মে গণপরিষদে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হলে ২১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বাংলা এবং উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। আর একুশের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একাত্তরে এসে ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তে ধোয়া স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা, স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় ভাষার মর্যাদা পেয়েছে বাংলা ভাষা। তবু আমাদের সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি। একুশের চেতনায় স্নাত হয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবাই এগিয়ে না এলে একুশের প্রতি যথাসম্মান জানানো হবে না। ❑

গবেষক, শিশুসাহিত্যিক ও শিক্ষক

গল্প

সৌরভে গৌরবে চেতনায় একুশ

অনুপম হায়াৎ

ক্লাশে ঢুকেই মনোয়ারা বেগম ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করেন-

- আচ্ছা বলো তো, এটা কোন মাস?

- এটা ফেব্রুয়ারি মাস ম্যাডাম।

সমস্বরে সবাই জবাব দেয়। শুধু একজন ছাত্র জবাব দেয়, এটা ফাল্গুন মাস ম্যাম।

ছাত্রটির নাম রফিক।

আচ্ছা আজ ফেব্রুয়ারির কত তারিখ? ম্যাডাম জানতে চান।

- ১৪ই ফেব্রুয়ারি ম্যাম। সবাই বলে।

ম্যাডাম মনোয়ারা বেগম আবার প্রশ্ন করেন; আজ ফাল্গুন মাসের কত তারিখ?

কেউ উত্তর দেয় না।

- ১লা ফাল্গুন, ম্যাডাম।

শুধু রফিক দাঁড়িয়ে উত্তর দেয়।

মনোয়ারা বেগম খুশি হয়ে রফিককে ধন্যবাদ জানায়। অতঃপর ম্যাডাম মনোয়ারা জানতে চান, তার রফিক নাম কে রেখেছে। রফিক জানায় যে, তার নানা এই নাম রেখেছেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনের সময় মিছিল করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে রফিক ও অন্যান্য কয়েকজন শহিদ হন। ওই সময় তার নানার বয়স ১০/১১ বছর। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে দেশে সব স্কুল-কলেজে মিছিল ও প্রতিবাদ হয়। তার নানা ওই মিছিল ও প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন। সেই থেকে নানার মনের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের সময় শহিদ রফিক, বরকত, শফিক, সালাম, জব্বার নামগুলো স্মৃতি হয়ে থাকে। নানা পরবর্তী জীবনে ওই শহিদদের স্মরণে তার বিভিন্ন নাতিদের নাম রাখেন।

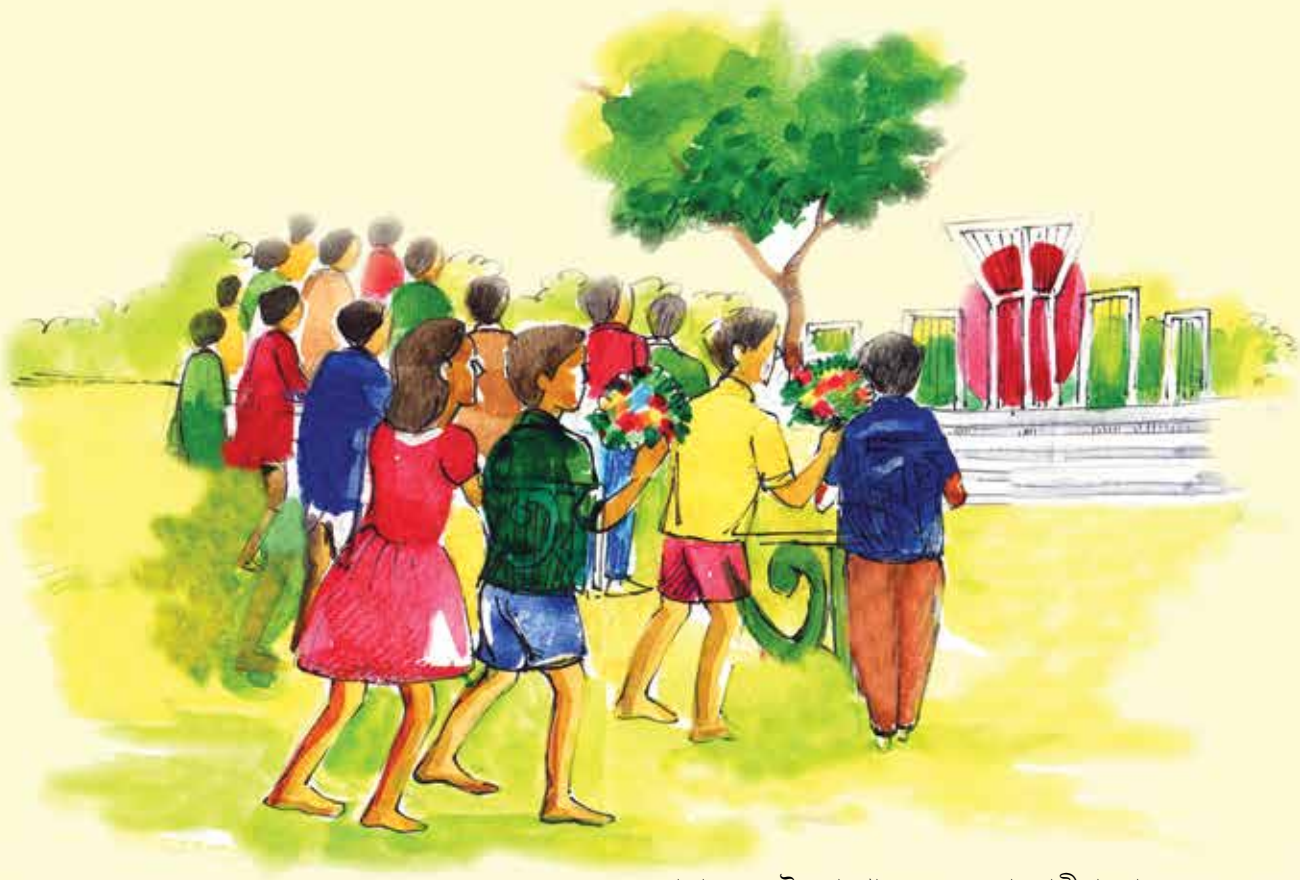

রফিকের মুখে এই কাহিনি শুনে ম্যাডাম মনোয়ারা বেগম বিস্মিত হন এবং রফিকের নানার প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

ম্যাডাম জানতে চান, রফিকের নানা সম্পর্কে। রফিক জানায় যে, তার নানা পরবর্তী জীবনে সাংবাদিকতা করতেন এবং তিনি কবিতাও লিখতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহায়তা করেন। এখন তিনি বেঁচে নেই।

মনোয়ারা বেগম ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে জানান, স্কুলের লাইব্রেরিতে ভাষা আন্দোলন ও শহিদদের সম্পর্কে অনেক বই আছে। এগুলো পড়ে আরো অনেক কিছু জানা যাবে। তিনি আরো জানান, আর সাতদিন পরেই শহিদ দিবস ২১শে ফ্রেব্রুয়ারি আসছে। এবার শহিদদের সম্পর্কে তোমাদের নিজের লেখা রচনা পাঠ করতে হবে। এ জন্যে প্রত্যেককে একটি করে 'বাংলা অভিধান' পুরস্কার দেয়া হবে।

ম্যাডামের এই ঘোষণা শুনে সব ছাত্রছাত্রীরা আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, শহিদ স্মৃতি অমর হোক, বাংলা ভাষা অমর হোক।

- আচ্ছা ম্যাডাম, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা কত তারিখ ও সাল ছিল, একজন জানতে চায়।

- ওই দিন ছিল ৮ই ফাল্গুন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

উত্তরে জানান মনোয়ারা বেগম।

আরেকজন ছাত্র জানতে চায়, ভাষা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহতদের 'শহিদ' বলা হয় কেন।

ম্যাডাম মনোয়ারা বলেন, ভালো কাজের জন্য, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যারা নিহত হয় বা প্রাণ দেয় তাদেরকে 'শহিদ' বলা হয়।

- আচ্ছা বলো তো, একুশে ফেব্রুয়ারির দিন কোন গানটা গাওয়া হয়?

- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।'

দাঁড়িয়ে জবাব দেয় একজন ছাত্রী।

- ওই গানটির লেখক ও সুরকার কে? ম্যাডাম আবার প্রশ্ন করেন।

কিন্তু কেউ উত্তর দেয় না।

অতঃপর ম্যাডাম নিজেই এই প্রশ্নের জবাব দেন।

- গানটি লিখেছেন আবদুল গাফফার চৌধুরী আর সুর করেছেন আলতাফ মাহমুদ।

ম্যাডাম আরো বলতে থাকেন, এই যে সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছোটো-বড়ো শহিদমিনার গড়ে উঠেছে, এগুলো কিন্তু ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদদের স্মরণে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছে প্রথম শহিদমিনার তৈরি করা হয় ইট-বালু-সিমেন্ট দিয়ে। কিন্তু পুলিশ তা ভেঙে ফেলে। পরে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা অনুসরণে বর্তমান আদলের শহিদমিনার তৈরি করা হয়। এই শহিদমিনার হচ্ছে শোক ও শক্তির প্রতীক। ছাত্রছাত্রীরা ম্যাডামের কাছ থেকে জানতে পারে একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ২০০০ সাল থেকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবেও পৃথিবীর সব দেশে পালিত হচ্ছে। জাতিসংঘের 'ইউনেস্কো' এই দিবসকে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিসব' হিসেবে ঘোষণা করে।

মনোয়ারা বেগম আরো বলেন, আমাদের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার ঘোষণা ও সংগ্রাম এবং অন্যান্য আন্দোলন সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের চেতনা প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। ম্যাডাম বলেন, শহিদদের আত্মত্যাগ আমাদের ভালোবাসা ও স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে। সৌরবে-গৌরবে তাঁরা আমাদের সকল কাজে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আবেগে ছাত্রছাত্রীরা সমবেত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'।

শহিদ স্মৃতি অমর হোক, বাংলা ভাষা অমর হোক। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

একুশ

শাহজাহান মোহাম্মদ

একুশ মানে দুখিনি মা'র
রক্তে মাখা আঁচল
একুশ মানে বোনের চোখের
মুছে যাওয়া কাজল।

একুশ মানে সন্তান হারা
বাবার আর্তনাদ।
একুশ মানে বন্ধু ছাড়া
খাঁ-খাঁ ধূ-ধূ মাঠ।

একুশ মানে অবুঝ শিশুর
টোল পড়া বোল
একুশ মানে পাঠশালাতে
বর্ণমালার ঢোল।

একুশ মানে ফুল পাখিদের
জেগে উঠার হাক।
একুশ মানে বীরদর্পে
বেঁচে থাকার ডাক।

একুশ মানে মাটির কোলে
শহিদ ভাইয়ের ঘুম
একুশ মানে স্বদেশ মাতার
কপাল ভরা চুম।

শিমুল-পলাশের গর্ব

সুজন বড়ুয়া

শিমুল একা একা হাওয়ায় দুলছিল। হঠাৎ দেখে তার পাশের গাছেই একটি কুঁড়ি ফুটে উঠছে। তখন তার আনন্দ আর ধরে না। এবার নেচে উঠতে ইচ্ছে হলো তার। মায়ের কাছ থেকে সে আগেই জেনেছে, পাশের গাছটা তাদের জাতভাই নয়। ওর নাম পলাশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের বাগানে দুটি পাশাপাশি গাছ শিমুল-পলাশ। শীতে পাতা ঝরিয়ে ন্যাড়া হয়ে যায় গাছ দুটি। তারপর বসন্তের শুরুতে ডালে ডালে ফুটে ওঠে ফুল। লাল টকটকে সে ফুলের রং। যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়।

পাশের পলাশ গাছে কুঁড়ি দেখতে পেয়ে শিমুল তার মাকে বলল, মা, আমি একটি সঙ্গী পেতে যাচ্ছি। আমার খুব খুশি লাগছে। সারাদিন ওর সঙ্গে কথা বলব আর হাওয়ায় হাওয়ায় নাচব। কী মজা!

মা একটু ধমকে উঠে বলল, শোন বাছা, এত আহ্লাদ ভালো না। দিনকাল বড়ো খারাপ। কখন কী হয় কিছু বলা যায় না। ছাত্ররা ফুঁসে উঠছে, দেখছিস না!

শিমুল অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকায়।

মা বুঝতে পারল, ছেলে তার কথা কিছু বোঝেনি। তাই মা বলতে শুরু করে আবার, বাবা, এ দেশের মানুষ সব কাজকর্মে তাদের মাতৃভাষা বাংলা ব্যবহার করতে চায়, কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা তা দেবে না। এজন্য দেশের মানুষ ক্ষুব্ধ। ছাত্রসমাজ সরকারের এ অন্যায়ের প্রতিবাদে আন্দোলন করছে। তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রদের আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছেন, মাওলানা ভাসানীও আন্দোলনের পক্ষে আছেন। ছাত্ররা এবার দাবি আদায় না করে ছাড়বে না।

পাশ থেকে পলাশের মা কান খাড়া করে শিমুলদের কথা শুনছিল। সে বলে উঠল, হ্যাঁ গো, পাকিস্তানি

শাসকরাও কিন্তু জঙ্গি হয়ে উঠছে। যে-কোনো সময় ভয়াবহ কিছু ঘটতে পারে। এমন কঠিন সময়ে তোদের জন্মরে বাছা! তোদের কেমন করে আগলে রাখব, আমরা ভেবে পাই না।

পলাশের মার কথা শুনে শিমুলের মাও কেমন চুপ হয়ে গেল। শিমুলের হাসিখুশি ভাবটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল হঠাৎ। গোমড়া মুখে এদিক-ওদিক দেখতে থাকে সে।

দুই

পরদিনই পলাশের কুঁড়িটা ফুল হয়ে ফুটল। শিমুল পলাশকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, এসো ছোটো ভাই, আমি তোমার অপেক্ষায় আছি। তোমাকে পেয়ে আমার খুব ভালো লাগছে। এতদিন এখানে আমি একাই ছিলাম। কথা বলারও কেউ ছিল না। সময় কাটতে চাইত না। এখন তোমার সঙ্গে গল্প করে আমার সময় কাটবে। একসঙ্গে সূর্যোদয় দেখব, সূর্যাস্ত দেখব, পূর্ণিমা দেখব। আহ্, কী মজা হবে! আনন্দে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।

পলাশের মা পাশ থেকে বলে উঠল এবার, শিমুল, ছোটো ভাইকে পেয়ে তুমি খুশি হয়েছ ভালো কথা। কিন্তু সেদিনের সব কথা কি ভুলে গেলে! তোমার মা বলল, আমি বললাম। দেশের অবস্থা ভালো না। শাসকরা আর ছাত্ররা একেবারে মুখোমুখি। যে-কোনো সময় খারাপ কিছু ঘটতে পারে।

পলাশ কিছু বুঝতে না পেরে মাকে বলল, মা, আমি তো কিছু জানি না। আমাকে সব কথা বলবে না?

মা বলল, হ্যাঁ বাবা বলব, তোমাকেও সাবধান হতে হবে। তাহলে শোনো, এ দেশের মানুষ বাঙালি। বাংলা তাদের ভাষা। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা তাদের বাংলা ভাষায় কথা বলতে দিতে চায় না। পাকিস্তানিরা বলে বাঙালিদের উর্দু বলতে হবে। এর প্রতিবাদে এ দেশের ছাত্র-জনতা সোচ্চার। তারা বুকের রক্ত দেবে, তবু মাতৃভাষার অমর্যাদা হতে দেবে না। তাদের চোখে ঘুম নেই। তারা সংগ্রাম করছে, মিছিল করছে, সমাবেশ করছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তারা প্রতিষ্ঠা করবেই।

পলাশ এবার বলল, তাতে আমাদের বিপদ কোথায় মা?

মা আবার বলতে শুরু করল, বিপদ আছেরে বাছা, বিপদ আছে। আমরা এ দেশের আলো-হাওয়ায় বেড়ে

উঠেছি। এ দেশের মানুষের হাতেই আমাদের বাঁচা-মরা। যাদের আদর-যত্নে আমরা বাঁচি। আমাদের অবশ্যই তাদের পক্ষে থাকতে হবে। তাছাড়া আমরা যে এলাকাটায় আছি এর নাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই বাংলা ভাষা আন্দোলনে আগুয়ান। ফলে শাসকগোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে কোনো মারামারি হলে তা এ এলাকাতেই হবে। সেজন্য আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে।

পলাশ বলে উঠল, আমরা কীভাবে সতর্ক থাকব মা? সতর্ক থাকলেই কি আমরা বাঁচতে পারব? আমাদের জীবনের সার্থকতাই-বা কোথায়?

মা বলল, বাছা, তোমরা হলে ফুল, সৌন্দর্যের প্রতীক। ফুলের সার্থকতা নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে। কারো ভালোবাসার উপহার হিসেবে ব্যবহার হতে পারলেই ফুলের জীবন সার্থক। তোমাদের সে চেষ্টাই করতে হবে।

শিমুল-পলাশের মুখে আর কোনো কথা নেই।

তিন

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। ফাল্গুন মাস এলেও শীতের আমেজ কমেনি। রাতটা বেশ হিম হিম কুয়াশার চাদরে মোড়ানো। এরই মধ্যে হলে হলে ছাত্ররা পোস্টার-ফেস্টুন তৈরির কাজে ব্যস্ত। আগামীকাল একুশে ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন বসবে। প্রাদেশিক পরিষদের ভবনটি হলো ঢাকা মেডিকেলের উত্তর-পশ্চিম কোণে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের কাছে গিয়ে বাংলা ভাষার দাবি সরাসরি তুলে ধরবে। এ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছে। কিন্তু ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙবে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তাই টানটান উত্তেজনা।

এর মাঝে সকাল হলো। চারদিক থমথমে। সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের টহল ভ্যান ঘুরছে। দুপুরের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের আমতলায় জড়ো হতে লাগল ছাত্ররা আর নানা বয়সের মানুষ। সিদ্ধান্ত হলো, সবাই একসঙ্গে বের হবে না। ৮-১০ জন করে ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে রাস্তায় বের হবে।

কথা মতোই কাজ শুরু হলো। কিন্তু পুলিশের বাধার মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল ছাত্ররা। গ্রেফতার হলো কেউ কেউ। যারা পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারল তারা এসে জড়ো হলো ঢাকা মেডিকেলের হোস্টেলে। এখান থেকে একেবারে কাছে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ ভবন। কিন্তু পরিষদ ভবনের প্রবেশ পথে পুলিশের ব্যারিকেড। ব্যারিকেড ভেঙে পরিষদ ভবনে প্রবেশের চেষ্টা চালাতে লাগল ছাত্ররা।

পুলিশ ছাত্রদের ভেতরে প্রবেশ করতে দিতে নারাজ। শুরু হলো পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-জনতার বাদানুবাদ। চরমে উঠল উত্তেজনা। এক পর্যায়ে শোনা গেল গুলির শব্দ। লুটিয়ে পড়ল কয়েকটি তাজা প্রাণ। মাথার খুলি উড়ে গেল কারো। সে এক বুক-ভাঙা দৃশ্য!

তবু আন্দোলনে ক্ষান্ত দিল না ছাত্র-জনতা। মাটি কামড়ে পড়ে থাকল রাজপথে। ঢাকা থেকে এ খবর ছড়িয়ে গেল দূরদূরান্তে, গ্রামেগঞ্জে। সারা দেশে যেন আগুন লেগে গেল মুহূর্তে। আশপাশের অঞ্চলের কৃষক-শ্রমিক ছাত্র-জনতা ছুটে আসতে লাগল ঢাকায়। মিছিলে-স্লোগানে-সমাবেশে কাঁপিয়ে তুলল রাজপথ।

২২-২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখও রাজপথে মিছিল, সমাবেশ, স্লোগান হলো। পুলিশরাও মিছিলের ওপর গুলি চালালো। শহিদ হলো আরো কয়েকজন। তার মধ্যে দু'জন শিশু।

শিমুল-পলাশ মায়ের কোলে বসে বসে চুপচাপ দেখল এসব কাণ্ড। দেখেশুনে একেবারে অবাক হয়ে গেল দুজন। এ কেমন ব্যাপার! নিজের মায়ের ভাষায় কেন কথা বলতে পারবে না মানুষ? কেন সেটা অপরাধ হবে? কেন এর জন্য এভাবে প্রাণ দিতে হবে? কিছুই ভেবে পায় না শিমুল-পলাশ।

তবে একটি কথা ভেবে গর্বে বুক ফুলে উঠল শিমুল-পলাশের। এ দেশের মানুষ মুখ বুজে অন্যায় সহ্য করেনি। মাথা উঁচু করে প্রতিবাদ করেছে। প্রাণ দিয়েছে, তবু মান দেয়নি। মাতৃভাষার দাবিও একদিন তারা নিশ্চয়ই আদায় করবে। এমন জাতির পাশে থাকতে কার না ভালো লাগে। আবেগে শিমুল-পলাশের মন ভরে গেল।

চার

পরদিন ২৪শে ফেব্রুয়ারি। শিমুল-পলাশ সকালবেলা দেখে সামনের রাস্তা ধরে ঢাকা মেডিকেলের দিকে মানুষ ছুটছে দলে দলে। কারো হাতে কালো পতাকা, কারো হাতে ফুল। কারো মুখে স্লোগান– শহিদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না। আমরা শহিদমিনার গড়তে জানি।

শিমুল-পলাশ মায়ের কোলে বসে দুলে দুলে এসব দেখে আর শোনে। দু'জনের চোখে-মুখে অপার বিস্ময়। এ কয়দিনে কত কাণ্ড ঘটে গেল!

রাজপথে লোকজনের চলাচল দেখতে দেখতে একটু যেন অন্যমনা হয়ে গিয়েছিল শিমুল-পলাশ। হঠাৎ চমকে ওঠে দু'জন। মায়ের কোল থেকে কে যেন ছিনিয়ে নিচ্ছে তাদের।

শিমুল-পলাশ ঘোর কাটিয়ে দেখে দুটি তরুণ ছেলে এসে তাদের দু'জনকে মুঠোয় পুরে নিয়েছে। দু'জনই একসঙ্গে বলে উঠল, মা তোমাদের কোল থেকে আমাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

শিমুলের মা বলল, যারে বাছা যা, ভয় পাস নে, আজ বড়ো শুভদিন, নিশ্চয়ই তোদের মঙ্গল হবে।

পলাশের মা বলল, বাবা, বলেছিলাম না, নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই ফুলের সার্থকতা। আজ তোদের নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার দিন। যা, নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য বিলিয়ে দে অন্যের জন্য। নিশ্চয়ই তোদের স্থান হবে উপযুক্ত পাত্রে।

মায়েদের আশীর্বাদ পেয়ে শান্ত হলো শিমুল-পলাশ। ছেলে দুটির হাতের মুঠোয় স্থির হয়ে থাকল দু'জন।

অল্পক্ষণের মধ্যে তারা যেখানে পৌঁছল, সেখানে লোকে লোকারণ্য। তিলধারণের ঠাঁই নেই। সবার চোখ-মুখ বিষাদময়, কিন্তু সুদৃঢ়। ইটের তৈরি তিনটি মাঝারি উচ্চতার স্তম্ভ সামনে রেখে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। স্তম্ভের সামনে শানবাঁধানো চওড়া বেদি। সারি করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে লোকজন। এগিয়ে এসে কেউ বেদিতে ফুল দিচ্ছে, কেউ দিচ্ছে নানা উপহারসামগ্রী।

কিছুক্ষণের মধ্যে সেই বেদিতেই স্থান হলো শিমুল-পলাশের।

শিমুল বলল, দেশের প্রথম শহিদমিনারে ঠাঁই পেলামরে, জীবন ধন্য হলো।

পলাশ বলল, বীরের বেদির উপকরণ হলাম, আর কিছু চাই না। ❑

গবেষক ও সাহিত্যিক

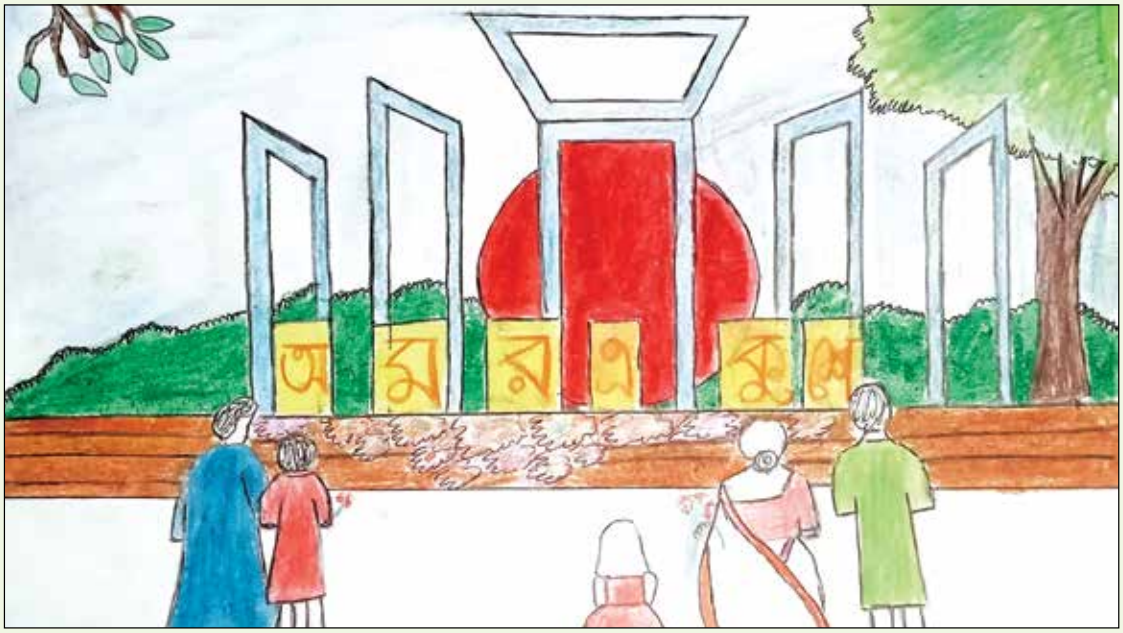

নাজিবা নাওয়াল, অষ্টম শ্রেণি, ওয়াই ডব্লিউ সি এ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, গ্রীণ রোড, ঢাকা

একুশের গান

বিচিত্র কুমার

একুশ এলেই মনে পড়ে
বর্ণমালার গান,
ভাষার প্রতি শহিদ ভাইদের
কী নিদারুণ টান।

ভাষার দাবিতে রাজপথে
দিলো যারা তাজা প্রাণ,
তাদের রক্তে লেখা হলো
বাংলা অভিধান।

মায়ের মুখের মাতৃভাষা
পেলো স্বাধীনতা,
একুশ এলেই পুষ্প শয্যায়
জানাই কৃতজ্ঞতা।

জীবন দিয়ে রেখে গেল
যারা মাতৃভাষার মান,
সেই শোকেতে গাই আমরা
একুশের গান।

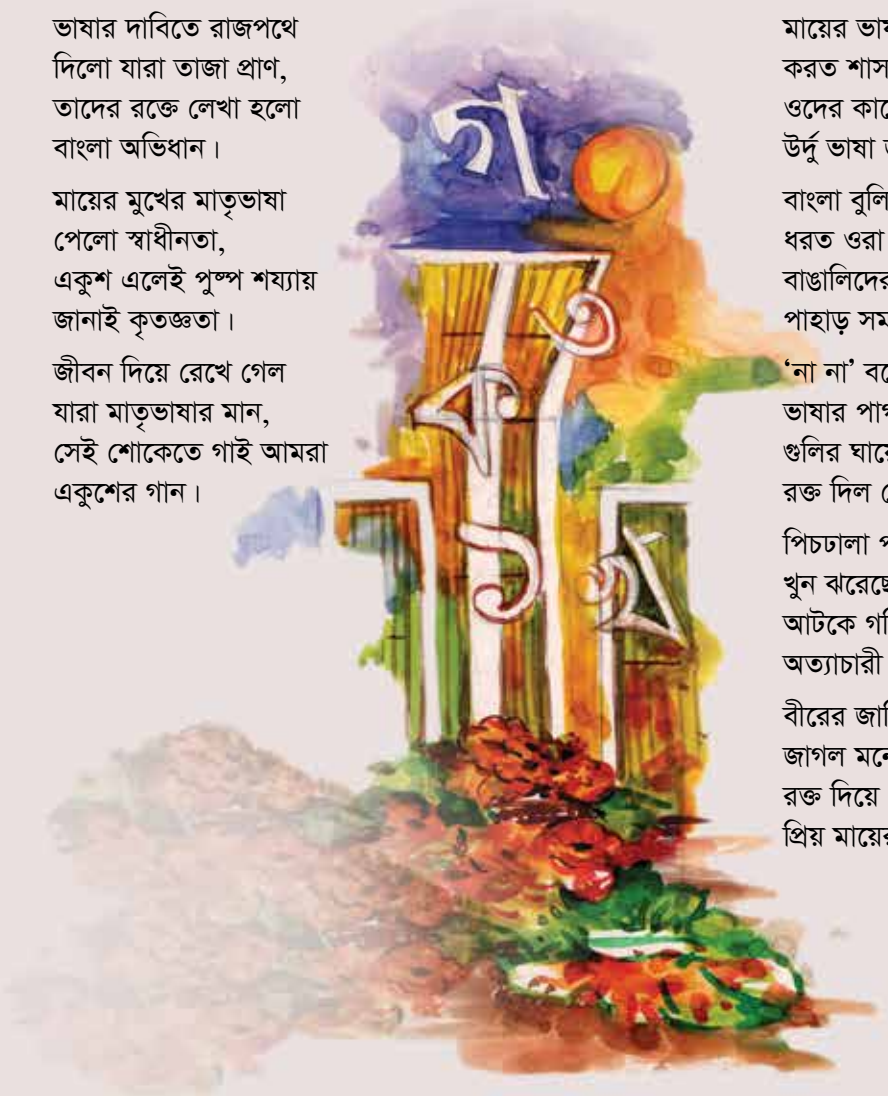

রক্ত দিয়ে কেনা

শচীন্দ্রনাথ গাইন

ফাগুন মাসে পলাশ-শিমুল
লাল রংটা মাখে,
শোকের নদী উথালপাতাল
কাঁদিয়ে চলে মাকে।

মায়ের ভাষায় বললে কথা
করত শাসক মানা,
ওদের কাছে দরকারি খুব
উর্দু ভাষা জানা।

বাংলা বুলি ফুটলে মুখে
ধরত ওরা দোষ,
বাঙালিদের ওপর ছিল
পাহাড় সমান রোষ।

'না না' বলে গর্জে ওঠে
ভাষার পাগল ছেলে,
গুলির ঘায়ে ঝাঁঝরা ওরা
রক্ত দিল ঢেলে।

পিচঢালা পথ লাল হয়েছে
খুন ঝরেছে তাজা,
আটকে গদি হাসতে থাকে
অত্যাচারী রাজা।

বীরের জাতি শক্ত তখন
জাগল মনে আশা,
রক্ত দিয়ে কেনা আমার
প্রিয় মায়ের ভাষা।

ফাগুন মাসে শিমুল হাসে

মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ

ধানের মাঠে নদীর ঘাটে
দাঁড়াও তুমি ভাই;
লাল-সবুজের দেখবে ছবি
তুলনা তার নাই।

আকাশ পাড়ে বাতাস নাড়ে
হলদে পরির দল-
নীল দিগন্তে পাখিরা ধায়
জোছনা মাখায় জল।

ফুলের বনে খুকুর সনে
হাসনাহেনার কুঁড়ি;
বাদলা বায়ে আলগোছে দেয়
একটা চুমকুড়ি।

ফাগুন মাসে শিমুল হাসে
কণ্ঠে ভাষার গান-
দীপ্ত সাহস চলার পথে
জাগায় সতেজ প্রাণ।

মায়ের মায়া আঁচল ছায়া
স্বদেশ ভূমির মাটি;
সেই ছায়াতে স্বপ্ন দেখে
জোর কদমে হাঁটি।

ফাগুনের কথা

রানাকুমার সিংহ

একটা পাখি শিস দিয়ে কয় আট ফাগুনের কথা
মায়ের ভাষার জন্য কেমন ভাঙে নীরবতা।

বাহান্নতে রাজপথে যে রক্তপলাশ ফোটে
ইতিহাসের সেসব কথা আজ পাখিটার ঠোঁটে।

কেমন করে আমার ভায়ের রক্তে কিনি ভাষা
বাংলা মায়ের মধুর বুলি জাগায় প্রাণে আশা।

ফুলগুলো সব পাপড়ি মেলে দিচ্ছে সুবাস আজও
বলছে ওরা ঘুমিয়ে নয় সুর হয়ে সব বাজো।

সেই ফাগুনে পালায় দূরে পাক হায়েনার উর্দু
ভাবতে থাকে জিন্না ও গংড় তুমকো কিয়া ছুড় দু!

কিন্তু ওরা তা জানেনি, বাহান্নেরই মন্ত্রে
স্বাধীনতার পরশ লাগে শিরায় এবং তন্ত্রে।

বাহান্ন আর একাত্তরের সুর হয়ে যায় একই
তাই তো আমার বাংলা মাকে গৌরবে আজ দেখি।

ভাষার জন্য এই পৃথিবীর দেয়নি কেউ আর রক্ত!
বিশ্বজুড়ে আজ দেখি তাই বাংলা ভাষার ভক্ত।

ফাগুন আসে

সিনথিয়া জালাল

ঋতুরাজের ফাগুন আসে
পাখির কলরোলে
পলাশ শিমুল কৃষ্ণচূড়া
রক্তরাঙা ফুলে
ফাগুন আসে দখিনা বাতাসে
সাদা মেঘ আকাশে ভাসে
কোকিল ডাকে কুহু সুরে
আমের মুকুল গাছ জুড়ে
ফুলের বুকে অলি নাচে
মধুর আলাপন।

দশম শ্রেণি, আবদুল আজিজ উচ্চ বিদ্যালয়, মাদারটেক, ঢাকা

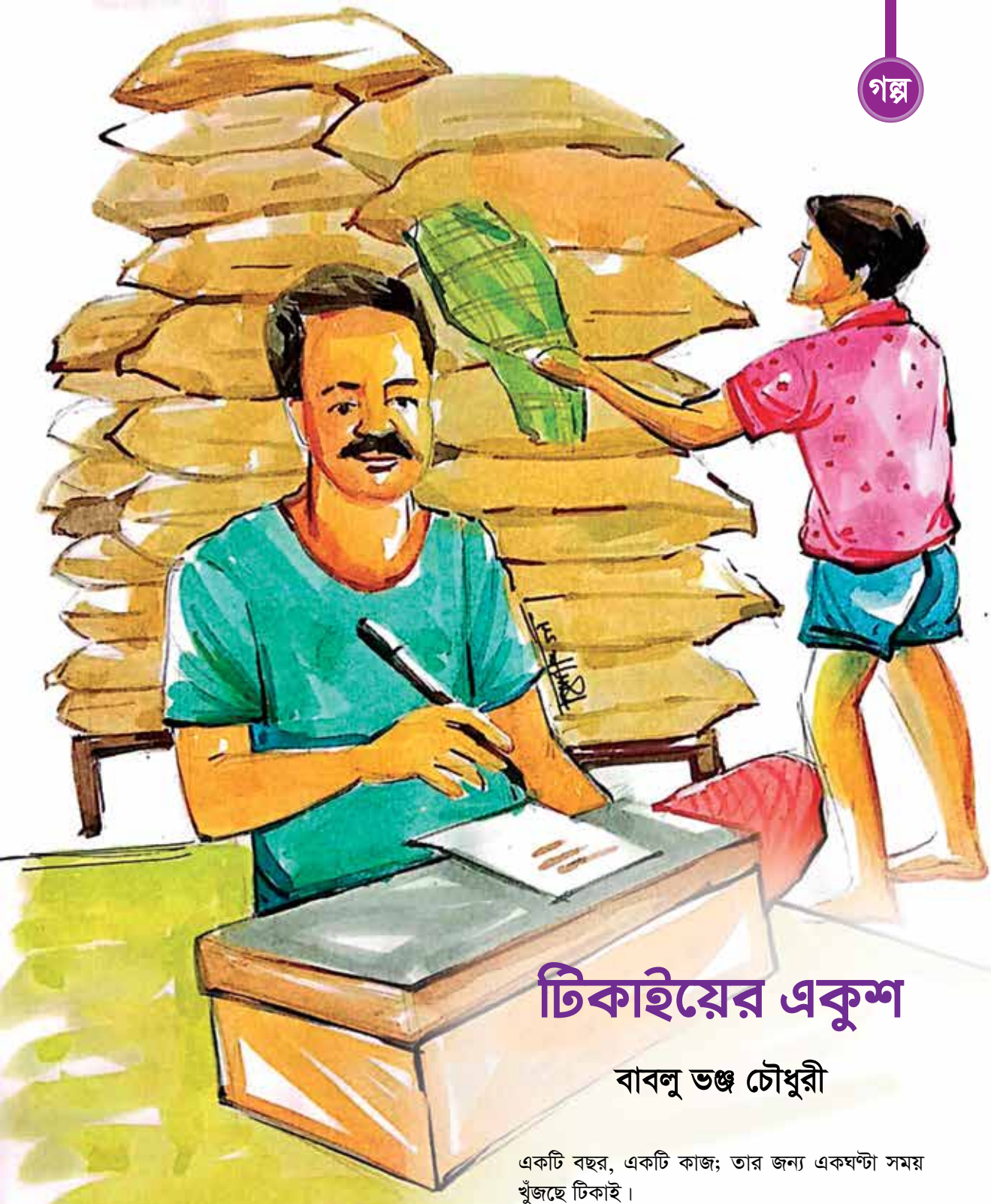

টিকাইয়ের একুশ

বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী

একটি বছর, একটি কাজ; তার জন্য একঘণ্টা সময় খুঁজছে টিকাই।

পাঁচিলের ওই পাশে স্কুল, এপাশে এক চিলতে ঘাসের চত্বরে ধান-চালের বিরাট আড়ত। ভোরের

আঁধার থাকতেই ধান-চালের ওম, গন্ধ আর কুঁড়োর ধুলার মধ্যে আড়ত ঘরের পেটে ঢুকতে হয় তাকে। সেখানে বস্তার ওপর বস্তা সাজানো, যেন বস্তার বাগান। সেই বাগানের মধ্যে লম্বা ঝুলন্ত দড়িতে ঝুলছে বিরাট দাঁড়িপাল্লা, তার ওপর সারাক্ষণ চালের বস্তা উঠছে। দূরদূরান্তের খুচরা বেপারিরা আসে চাল কিনতে। ভেতরে জ্বলজ্বলে বিদ্যুতের আলো, সব বেপারিরা ফিরে গেলে যখন বাইরে এসে দাঁড়ায় টিকাই, তখন সূর্য উঠে যায়, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কিন্তু আজ সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বের হতে হবে তাকে। এই ছুটির কথাটা বলার জন্যই বারে বারে সে কাজে বিরতি দেয়। চোখে কথা নিয়ে চেয়ে থাকে আড়ত-ম্যানেজারের দিকে। ম্যানেজার বস্তার হিসাব রাখতেই ব্যস্ত। টিকাইয়ের দিকে তাকানোর সময় নেই। সারা মাথা কুঁড়োর কুচিতে ভরা, কোঁকড়ানো জামাটার ভাঁজে ভাঁজে কুঁড়ো, হাঁটু পর্যন্ত নেমে আসা বড়ো কালো হাফ প্যান্টটা কুঁড়োর ধুলায় সাদা হয়ে আছে। উচ্চতা চালভর্তি বস্তার সমান, কিংবা তার চেয়ে একটু বেশি। তবে সবার নজর বস্তার দিকে থাকলেও তার দিকে কারো নজর নেই। সবাই ব্যস্ত। ছুটির কথা বোঝানোর আশা বাদ দিয়ে সে চলে যায় গেটের কাছে। তখনই নজর পড়ে ম্যানেজারের, 'কীরে টিকাই! চাল-কুঁড়োয় তো পথ আটকে গেল, পরিষ্কার করছিস না কেন?' টিকাই স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নেড়ে বোঝায়। সে বলতে চায়-আজ না হয় পাঁচ টাকাই দেবেন, পুরো টাকা দিতে হবে না, আজ আমায় ছুটি দিন, জরুরি কাজ আছে।

কিন্তু এই নতুন ম্যানেজার তার ভাষা কিছুই বোঝে না। শুধু মুচকি হাসে, সেদিন যেমন হেসেছিল। মায়ের পেটে ব্যথা। ওষুধ কেনার জন্য টিকাই ছুটি চেয়েছিল। পেটে হাত দিয়ে দিয়ে সে কত দেখালো, কত বোঝানোর চেষ্টা করল, ম্যানেজার বুঝল না। মুচকি হেসে কাজ করবার জন্য তাড়া লাগালো। কিন্তু আজ তাকে বুঝতেই হবে। আজ ঘটনা ঘটিয়েই বোঝাবে। তাতে যদি কাজটি চলে যায়, কী আর করা!

ফতেপুরের বাক্কার গাজীর একশ বস্তা, উজিরপুরের নরেন মল্লিকের দেড়শ বস্তা-এমন সব চালের হিসাবের মধ্যে ম্যানেজার যখন ডুবে গেল, টুপ করে গেট পেরিয়ে বাইরে এল টিকাই। তখন পূব দিগন্তে কুয়াশা ভেদ করে চাকতির মতো বিশাল লাল টকটকে সূর্য উঁকি দিচ্ছে। এত বড়ো সূর্য আগে দেখেনি টিকাই, অথচ প্রতিদিন সূর্য জাগার আগে সে জাগে।

পাঁচিলের ওদিক থেকে মাইকে হুশ করে গেয়ে ওঠে, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি...'। হঠাৎ সমস্ত ভোর এই গানে মুখরিত হয়ে ঢুকে পড়ল টিকাইয়ের মধ্যে। জলের ওপর জোরে জোরে বৃষ্টি ফোঁটা পড়লে জল যেমন টগবগ করে নাচতে থাকে, আনন্দে তেমনি নাচতে নাচতে আর মুখে 'আঁঃ আঁঃ' করে মাইকের গানের সঙ্গে গলা মেলাতে মেলাতে সে ছুটে চলল গোডাউন ঘরের পিছন দিকে। এখানে কলাবনের মধ্যে পুরনো জিনিসপত্র রাখার একটা ঘর আছে। দরজাটা টিনের। সবেগে সেটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে ভাঙা একটা তক্তোপোষের তলার ঝুড়ি থেকে বের করল একটা কাগজ। চোখ পেতে খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখল সেটা। লিগ্যাল সাইজের কাগজে লাল কালিতে 'অ আ ক খ' লেখা। লিখেছে টিকাই। কিন্তু বাইরের কারো পক্ষে তা বোঝার উপায় নেই। সে-ই বোঝে, আর বোঝে তার মা। মায়ের পায়ের আলতা দিয়েই আজ দু-দিন ধরে গোপনে সে এগুলো লিখেছে। 'অ' অক্ষরটা এবড়োখেবড়ো অর্ধবৃত্তের মতো, আকারটা ছড়িয়ে আছে-যেন আলগোছে রাখা একটা ঘাসের ডগা। 'আ' অক্ষরটাও প্রায় তাই। 'ক' টা কলার কাঁদির মতো, আর 'খ' অক্ষরটা যে কেমন! তা কখনও একটা ফোলা খইয়ের মতো, কখনও শিউলি ফুলের একটা পাপড়ির মতো। সব অক্ষরগুলো আবার একসঙ্গে দেখলে ছড়ানো-ছিটানো ফুলের পাপড়ির মতো মনে হবে।

একুশের গান থামল। টিকাই ভাবল দেরি হয়ে যাচ্ছে। তক্ষুণি সে কাগজটা নিয়ে গোডাউনের চত্বর চিরে ছুটতে লাগল পাঁচিলের দিকে। পাঁচিল টপকালেই স্কুল মাঠের শহিদমিনার। তার গন্তব্য সে পর্যন্ত। হঠাৎ পিছন থেকে ম্যানেজারের গলা, 'অ্যাই কোথায় যাচ্ছিস! না

বলে চলে এসেছিস যে!' টিকাই থমকে দাঁড়িয়ে দেখল গোডাউনের গেটের বাইরে চার-পাঁচজন লোকসহ ম্যানেজার দাঁড়িয়ে আছে। সবার নজর তার দিকে। টিকাই সর্বাঙ্গ ঝাঁকিয়ে হাতের কাগজখানা দেখিয়ে মুখে 'আঁঃ-আঁঃ' শব্দ করে বোঝাতে লাগল যে, এটা 'অ-আ-ক-খ', সে নিজে লিখেছে, আজ একুশে ফেব্রুয়ারি, শহিদমিনারে দিতে যাচ্ছে। ম্যানেজার ভুরু কুঁচকে কাগজখানার দিকে তাকিয়ে দূর থেকে কিছুই বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, 'কীসের ছবি?' ছবির কথা শুনে টিকাই আরও জোরে জোরে 'আঁঃ-আঁঃ' করে একই কথা বোঝানোর চেষ্টা করল, কষ্টে তার গলা ফুলে উঠল।

ম্যানেজার বুঝতেই পারছে না। জিজ্ঞেস করল, 'কী লেখা? ৩০০০ টাকা?' ম্যানেজার অর্ধবৃত্তের 'অ'-টাকে ৩ ভেবেছে। বোঝাতে না পারার কষ্ট বেড়ে যাচ্ছে টিকাইয়ের। সে নিজেকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত দিয়ে ছুটে গেল পাঁচিলের কাছে। ম্যানেজারও দলবল নিয়ে টিকাইয়ের পিছু পিছু এসে দাঁড়ালো পাঁচিলের কাছে। একটা আমগাছ হেলে পড়েছে পাঁচিলের ওপর। সেটা বেয়ে টিকাই এক লাফে ওপাশে নেমে গেল স্কুলের মাঠে। ম্যানেজার সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, স্কুলের মাঠ ধরে টিকাই সটান চলে যাচ্ছে শহিদমিনারের দিকে। যেতে যেতে বারে বারে পিছন ফিরে তাদেরকে দেখে নিচ্ছে।

স্কুলের শহিদমিনারের বেদিটি ফুলে-ফুলে ঠাসা। ফুলের রাশের মধ্যে বড়ো একটা আর্ট

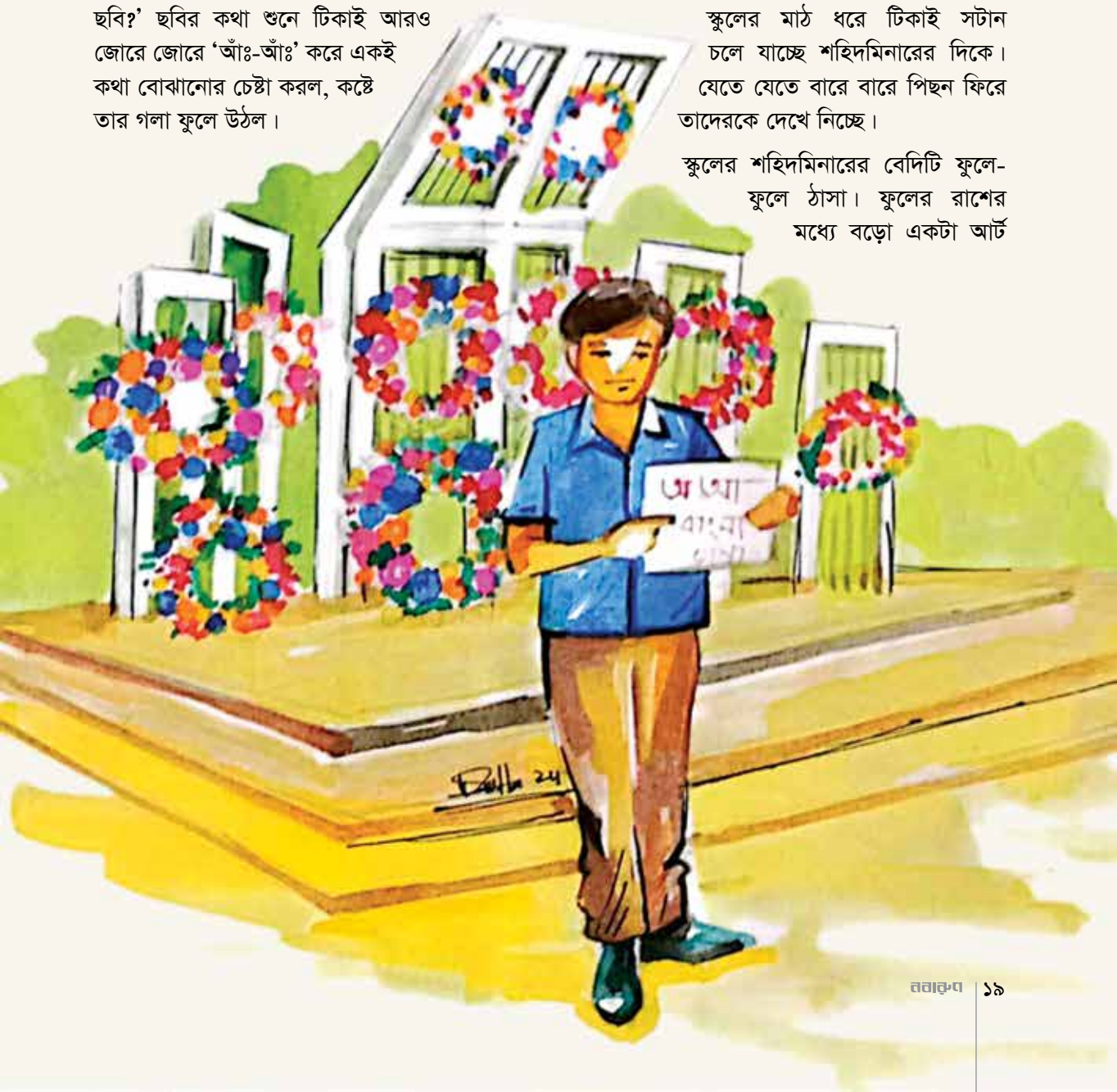

পেপার সাঁটানো, তাতে লালকালিতে লেখা-'অ-আ-ক-খ', 'আ-মরি বাংলা ভাষা'। বেদির ওপর এখন কেউ নেই। একদল ছেলে-মেয়ে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের নজর শহিদমিনারের দিকে। টিকাই সোজা শহিদমিনারের বেদিতে উঠে গিয়ে লাল কালিতে স্পষ্ট করে লেখা- 'অ-আ-ক-খ'র কাগজখানায় একটা আঙুল ঠেকিয়ে সেই আঙুল নিজের বুকের সঙ্গে ধরা কাগজখানার ওপর রেখে 'আঁঃ আঁঃ' করে দূরে দাঁড়ানো ম্যানেজারকে বোঝালো যে, সেও ওই কাগজখানায় এরকম 'অ-আ-ক-খ' লিখেছে। আজ ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সেটা বেদিতে রাখতে হবে, এজন্যই তার ছুটির দরকার ছিল।

ম্যানেজার হাঁ-হয়ে টিকাইয়ের কাণ্ড দেখছিল, হঠাৎ তার কাঁধে একটা হাতের ছোঁয়া পড়ল। ইনি আড়ত মালিকের ছেলে। ম্যানেজারকে বললেন, 'টিকাইয়ের ভাষার সংকট, আমরা যে ওর ভাষা বুঝতে পারছি না, এটা ওর কাছে আমাদের সংকট। আজ একুশে ফেব্রুয়ারি, আসুন এই সংকট মিটিয়ে ফেলি, ও যে আপনার কাছে কী চেয়েছে, সেটা তো এখন বুঝতে পারছেন!' ম্যানেজার মাথা নাড়ালো। তারপর টিকাইয়ের দিকে চেয়ে সহাস্যে চেঁচিয়ে বলল, 'তোমার ছুটির ভাষা বুঝতে পেরেছি, তুমি ছুটি চেয়েছিলে, আজ তোমার ছুটি!'

ম্যানেজারের কথায় ভোরের আলোর মতো একটা হাসি ভরিয়ে দিল টিকাইয়ের সমস্ত অন্তর। ম্যানেজার তার কথা বুঝতে পেরেছে! সেই আনন্দে সে হাতের কাগজখানা নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে মাঠময় ছুটতে লাগল। মুখে আঁঃ আঁঃ শব্দ করে বলতে লাগল, ম্যানেজার আমার ভাষা বুঝতে পেরেছে! আ-মরি বাংলা ভাষা!

মাঠে উপস্থিত সবাই স্তব্ধ হয়ে সেই দৃশ্য দেখল, কিন্তু কেউ তার কথা বুঝতে পারল না। বুঝল শুধু তিন স্তম্ভের শহিদমিনারটি। ❑

শিশুসাহিত্যিক

একুশ এল

মো. মুশফিকুর রহমান মিদুল

বছর ঘুরে আবার এল
একুশে ফেব্রুয়ারি
বুকের পাজরে জমে আছে
হাজারো কষ্ট সারি সারি।

শত শহিদের পরিবারের হাহাকার
হাজারো শিশুর আত্মচিৎকার
কত ছেলে হারা মা
অশ্রু মুছে বার বার ।
এমন ইতিহাস দেখেনি বিশ্ব আর
ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে কোন জাতি এত বার
একমাত্র ইতিহাস বাঙালির এই বাংলার।

স্মরণ করিয়ে দেয় যে একুশে ফেব্রুয়ারি
তাই ভাষার জন্য আমরা গর্ব করি।

একাদশ শ্রেণি, ডিএমআরসি কলেজ, ঢাকা

ভাষা আন্দোলনের সূতিকাগার

নাসীমুল বারী

‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি. . .’

এই গানটা বিশ্বে বাংলাদেশকে বিশেষভাবে পরিচিত করে তুলেছে। এ গান বাঙালির ভাষা রক্ষার গৌরবগাথা। ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক অধ্যায়। বাংলা ভাষাকে রক্ষার স্বীকৃত পরিচিতি।

প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরনো ভাষা বাংলা। ভারতীয় উপমহাদেশে একমাত্র বাংলা ভাষাই নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। ঐতিহ্য আর গৌরবের সে ভাষাভাষীর বড়ো একটা অংশের বসবাস আমাদের বাংলাদেশে। আর আমাদেরকেই কিনা সেই বাংলা ভাষা, বাংলা বর্ণমালা বাদ দিয়ে উর্দু ভাষাভাষী মানুষ হতে বলেছিল। উর্দু হরফে বাংলা লেখার উদ্যোগ নিয়েছিল। এমনকি রোমান হরফেও বাংলা লেখার একটা প্রস্তাব করা হয়েছিল। বাঙালি তাই বাংলা ভাষা রক্ষার জন্য শুরু করে আন্দোলন। সে আন্দোলনের প্রাথমিক বিজয় ১৯৪৮ সালে আর পরিণতি ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারি। এ আন্দোলন কোথা থেকে শুরু হয়েছিল- সে কথাই শোনাচ্ছি আজ।

আমাদের এ বাংলাদেশের পূর্ব নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান, তারও পূর্বে ছিল পূর্ববাংলা বা পূর্ববঙ্গ। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের থেকে স্বাধিকারপ্রাপ্ত নতুন দেশ পাকিস্তানের দুটি অংশ ছিল- পশ্চিম পাকিস্তান আর আমাদের এ পূর্ববঙ্গ। এ পূর্ববঙ্গ ছিল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন অংশ।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীন হওয়া পাকিস্তানের নব্য শাসকরা সাম্রাজ্যবাদী চেতনা থেকে বাঙালির ভাষা বাংলাকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল। তারা বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল।

পুরো পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল সে সময় সাত কোটি। এরমধ্যে সাড়ে চার কোটি বাংলা ভাষাভাষী। পূর্ব বাংলার শতভাগ লোকই বাংলা ভাষাভাষী। যদিও বাংলার বাইরে থেকে ভারতের বিহার আর পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কিছু মানুষের বসবাস

ভাষার দাবিতে অনেকের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ, ১১ই মার্চ ১৯৪৮

ছিল পূর্ব বাংলায়, তবুও মূল বাংলাভাষী ছিল সাড়ে চার কোটির মতো। অবশিষ্ট আড়াই কোটি মানুষের মাতৃভাষা ছিল অনেকগুলো। এরমধ্যে প্রধান পাঁচটি হলো উর্দু, পশতু, সিন্ধি, বেলুচি ও পাঞ্জাবি। সে হিসেবে গড় করলে উর্দু মাতৃভাষী জনসংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ হাজার বা তারও কম। ওই পাঁচটি ভাষার মধ্যে আবার উর্দুর স্থান ছিল দ্বিতীয়।

এবার হিসাবটা করে দেখো, পুরো পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা কত বেশি, আর উর্দুভাষী কত কম! সে উর্দু ভাষাকেই কিনা বাঙালির উপর চাপিয়ে দিতে বলা হয়েছিল। উর্দু হবে বাঙালির তথা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এটা কি মেনে নেওয়া যায়?

আরো কী ফন্দি এঁটেছিল ওই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী, শুনলে পিলে চমকে যাবে। ওরা বলেছিল আচ্ছা উর্দুতে কথা না বলতে চাইলেও বাংলাতেই বলুক; কিন্তু লিখতে হবে উর্দু বর্ণমালায়। ধরো তুমি 'মা' লিখবে। মুখে 'মা' বললেও লেখার সময় ম-এর সাথে 'আকার' দিয়ে 'মা' লিখতে পারবে না। লিখতে হবে উর্দু মিম-এর সাথে আলিফ-ইয়ে মিশিয়ে।

বাহ্! কী চমৎকার তাদের আবদার। আবার আরেকজন বলেছিল আচ্ছা উর্দুতে না লিখলে রোমান হরফে লিখো। এর মানে বাংলা ভাষা ও বর্ণমালা দুটোকেই বাদ দিতে হবে। দেখলে বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার কী গভীর ষড়যন্ত্র!

হ্যাঁ, বাংলা ভাষাকে রক্ষা করে শিক্ষার মাধ্যম ও রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন শুরু হয় তাই পাকিস্তান জন্মের অর্ধমাস পরেই। ১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হলো। আর ওই ষড়যন্ত্র রুখতে মাত্র ষোলো দিন পর সাতচল্লিশের এক সেপ্টেম্বরেই বাংলা ভাষা রক্ষা করার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হলো বাঙালিকে। বাঙালির প্রতি অবিচার আর বৈষম্য স্বাধীন পাকিস্তানের জন্ম থেকেই শুরু করা হয়েছিল।

অকুতোভয় বাঙালি নিজের অধিকারকে রক্ষা করতে জানে। ভাষার অধিকার রক্ষা করার এ আন্দোলন যেখান থেকে গড়ে তোলা হয়েছিল, সেটাই ভাষা আন্দোলনের সূতিকাগার বা জন্মস্থান। স্থানটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটবর্তী এলাকা আজিমপুর-এর উনিশ নম্বর বাড়িটি।

সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের একজন প্রভাষক ছিলেন আবুল কাসেম। তিনি ভাবলেন বাঙালিকে শিক্ষা-বিজ্ঞানে এগিয়ে নিয়ে

যেতে হলে মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। সে সময় মেট্রিকুলেশন অর্থাৎ আজকের এসএসসি পর্যায়ের পরীক্ষায় হয়ত বাংলা ভাষায় দেওয়া যেতো। তারপর উচ্চতর সব পড়াশোনা ইংরেজি ভাষায় করতে হতো। উচ্চতর এসব পড়াশোনা বাংলা ভাষার মাধ্যমে হলে বাঙালি আরো অনেক বেশি শিক্ষিত হয়ে ওঠতে পারবে। সে চিন্তা থেকেই আবুল কাসেম ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের একটা ক্লাসে বাংলায় লেকচার দেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এটা ভালোভাবে নেয়নি। তাকে সতর্ক করে বাংলায় লেকচার দিতে নিষেধ করা হয়। এদিকে পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশদের থেকে পাকিস্তান স্বাধীন হলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ছেচল্লিশের বাংলা লেকচারের ঘটনা এবং নেতৃবৃন্দের সুপ্ত মনোবাসনা আবুল কাসেমকে বিদ্রোহী করে তোলে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন পাকিস্তানের ষোলো দিনের মাথায় ১৯৪৭-এর ১লা সেপ্টেম্বর তার বাসা ১৯ আজিমপুর রোডে ইফতারের দাওয়াত দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রনেতা আর শিক্ষকদের। ইফতার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীতে সেখানে একটা সভাও করা হবে। এ সভাতেই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করে রক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এজন্য আন্দোলন গড়ে তোলার ভাবনার জন্ম নেয়।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে উনিশ আজিমপুর রোডের আবুল কাসেমের বাসায় অনুষ্ঠিত হয় সভা ও ইফতার মাহফিল। এ সভাতে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক নূরুল হক ভূইয়া, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক এ. কে. এম. আহসান। ছাত্রনেতাদের মধ্যে ছিলেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্রসংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম (পরবর্তীকালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি), শামসুল আলম, নঈমউদ্দিন আহমদ, ফজলুর রহমান ভূঁইয়া, আজিজ আহমদ এবং আরও অনেকে।

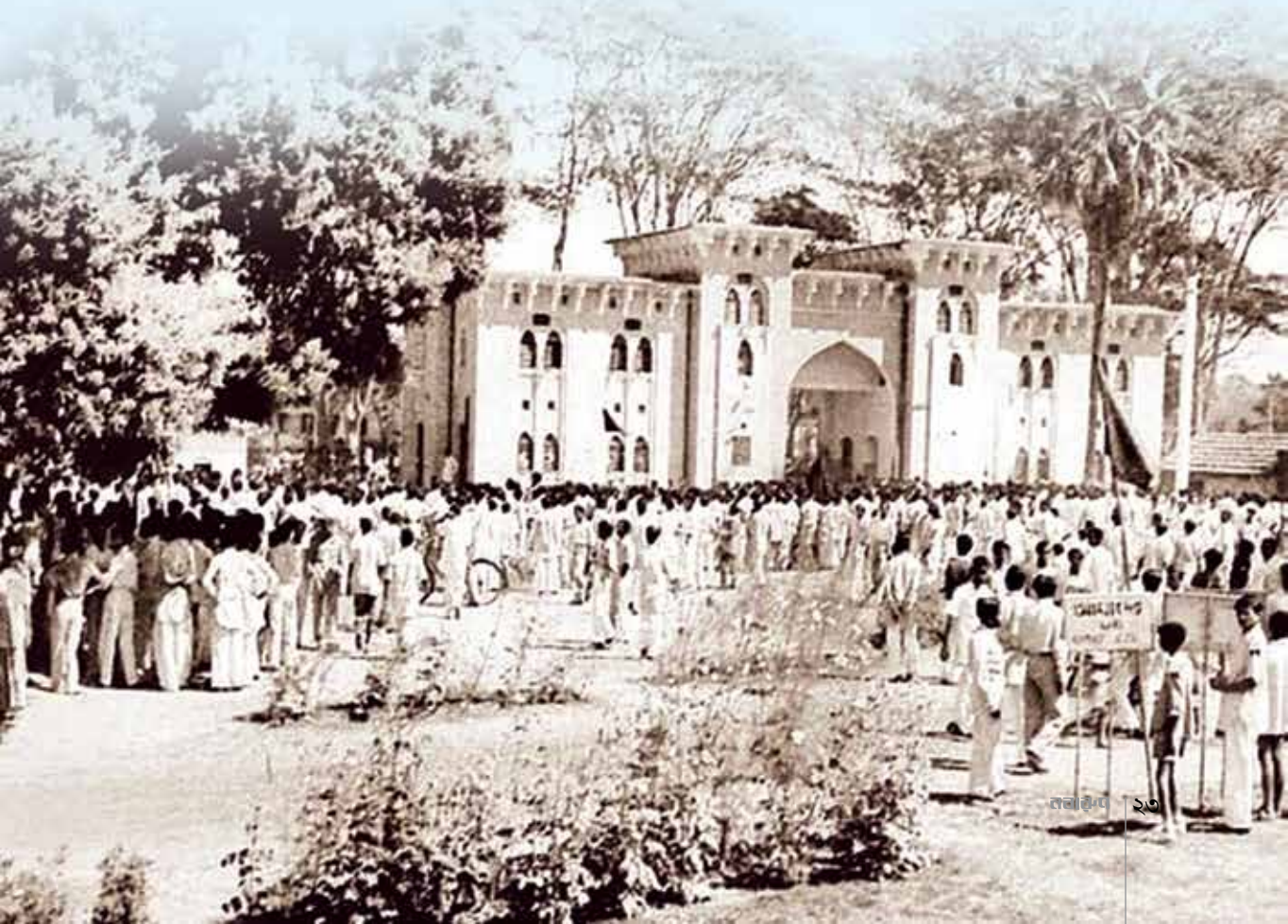

সূচনা বক্তব্যে আবুল কাসেম বাংলায় উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তবে ইচ্ছে করলেই নিজের খেয়াল-খুশিতে কেউ বাংলায় শিক্ষা দিতে বা গ্রহণ করতে পারবে না। রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ছাড়া বাংলায় উচ্চশিক্ষা দেওয়া সম্ভবও না। রাষ্ট্রের শিক্ষার বাহন বাংলায় হলে তবেই সম্ভব। এজন্য বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। তেমন একটা কিছু করার কর্মসূচি নিয়েই এখানে সমবেত হয়েছিলেন সেদিন শিক্ষক-ছাত্রবৃন্দ। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি আদায় করে নিতে হবে। এটা ছিল সেসময় বাঙালির নব-অস্তিত্বের লড়াই।

বাহ্! কী চমৎকার তাদের আবদার। আবার আরেকজন বলেছিল আচ্ছা উর্দুতে না লিখলে রোমান হরফে লিখো। এর মানে বাংলা ভাষা ও বর্ণমালা দুটোকেই বাদ দিতে হবে। দেখলে বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার কী গভীর ষড়যন্ত্র!

সেখানে অনেক আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সাধারণ মানুষকে জানাতে হবে, জাগাতে হবে। ধীরে ধীরে গণদাবিতে পরিণত করতে হবে। এজন্য সাহিত্যসভা, সেমিনার, পুস্তক-পুস্তিকা, হ্যান্ডবিল- পোস্টার ইত্যাদি প্রকাশ করে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

আবুল কাসেমের এই উদ্যোগকে সবাই খুবই যুগোপযোগী বলে প্রশংসা করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্রসংসদের প্রচার সম্পাদক ফজলুর রহমান ভূইয়া 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়।

এভাবে গড়ে ওঠে তমদ্দুন মজলিস। এর কার্যালয় স্থাপিত হয় ১৯ আজিমপুর রোডে। এখান থেকেই ভাষা আন্দোলনের কার্যক্রম শুরু হয়। অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পাকিস্তানের প্রথম হরতাল পালিত হয়। এ হরতাল আহবানের জন্য পত্রিকায় যে প্রেসবিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল, সেখানে চারজন স্বাক্ষর করেন; তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষার দাবির এ হরতালের দিন অনেকের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতারও হয়েছিলেন।

সরকারের এমন আচরণে সারাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। অবশেষে সরকার ভীত হয়ে ১৫ই মার্চ ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনকারীদের সাথে একটি চুক্তি করে। আট দফা চুক্তির অন্যতম ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা হবে। ভাষা আন্দোলনরকারীর পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন আবুল কাসেম।

কিন্তু ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার এ চুক্তি ভঙ্গ করে আবার ঘোষণা দেয় 'উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। ব্যাস!

আবার গর্জে ওঠে বাঙালি। এবার আন্দোলন আরো তীব্র হয়। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদ ঘেরাও কর্মসূচি দেওয়া হয় বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি। সরকার তা রুখতে ১৪৪ ধারা জারি করে। নির্ভীক বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঘেরাও কর্মসূচি পালন করতে।

সরকারও বসে নেই। আন্দোলন প্রতিরোধ করতে সরাসরি গুলি চালায়। আহত-নিহত হয় অনেক। শহিদি লাশ পাওয়া যায় চারটি। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলনের তীব্রতা। সরকার বাধ্য হয়ে একদিন পরেই পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদ পাস করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে পাঠানো হবে।

এভাবেই গড়ে ওঠে আজকের একুশের ইতিহাস। এর শুরু ১৯৪৭ এর ১লা সেপ্টেম্বর, উনিশ আজিমপুর রোড থেকে। উনিশ আজিমপুর রোড তাই আমাদের অস্তিত্বের, আমাদের শেকড়ের উৎসমূল। ❑

প্রাবন্ধিক

একুশ আসে

বিজন বেপারী

একুশ আমার বুকের মাঝে
যায় শুনিয়ে গান
একুশ আসে জানিয়ে যায়
বাংলা ভাষার মান।

একুশ আমার আলোর মিছিল
পলাশ ফুলের মালা
একুশ আসে শত্রু বুকে
ধরায় বিষম জ্বালা।

একুশ আমার দেশটা গড়ে
ভীষণ যুদ্ধ শেষে
একুশ আসে গর্ব নিয়ে
সোনার বাংলাদেশে।

একুশ আমার অহংকার
বিশ্ববাসীর কাছে
একুশ আসে শ্রদ্ধা জানাই
শহিদ সালাম বাঁচে।

একুশের ইতিহাস

জাহিদ বিন হিকমত

একুশ মানে মাতৃভাষাকে নিয়ে আন্দোলন
একুশ মানে ঢাকা রেসকোর্সে ভাষণের পর ভাষণ।
একুশ মানে উর্দুকে নিয়ে কুচক্রদের অঙ্গীকার,
একুশ মানে ছাত্র-জনতার না না প্রতিবাদের হুংকার।

একুশ মানে ছাত্র-নওজোয়ানদের ভাষা রক্ষার আহ্বান,
একুশ মানে ধর্মঘট ভাঙার শ্লোগান।
একুশ মানে কালো রাস্তা রক্তে রঞ্জিত হওয়া,
একুশ মানে প্রাণের দাবিকে পাওয়া।

একুশ মানে হাজারো মায়ের ছেলে হারা কান্না,
একুশ মানে অশ্রুশিক্ত পিতার হৃদয়ের যন্ত্রণা।
একুশ মানে মাকে মা ডাকার বাসনা,
একুশ মানে বাঙালির জেগে উঠার চেতনা।

একুশ মানে মাতৃভাষা বাংলা হওয়ার অভিলাষ,
একুশ মানে ছাত্র-জনতার ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত ইতিহাস।

ভাষা

মানতাকা তাবাস্‌সুম গুড়িয়া

মুখের ভাষা পেতে আছে ত্যাগের ইতিহাস
স্বজন হারানোর ব্যথায় ভরা ফেব্রুয়ারি মাস।
একুশে ফ্রেব্রুয়ারিতে রক্ত দিলেন যারা
আমাদের ভাষার প্রদীপ তারা।
সালাম বরকত রফিকেরা
জীবন দিলো হেসে,
তাজা রক্তে কিনলো ভাষা
বাংলাকে ভালোবেসে।

দশম শ্রেণি, চিলাহাটি মার্সেস হাইস্কুল, নিলফামারী

মিছিল হবে কাল

পরিতোষ বাবলু

পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়ায়
রং ধরেছে লাল
দস্যি খোকা জানিয়ে দিলো
মিছিল হবে কাল!

মিছিল হবে বাংলা ভাষার
জাগবে শহর ঢাকা
আট ফাগুনে দস্যি খোকার
হয়নি ঘরে থাকা!

দোর খুলে সব বাইরে এসো
বলল ভোরের কাক
গলির মোড়ে ওই শোনা যায়
মিছিল যাবার ডাক।

সেই মিছিলে দস্যি খোকা
রক্তে হলো লাল
খোকার মতো কেউ বলে না
মিছিল হবে কাল!

আত্মত্যাগের কথা

মুহাম্মদ ইসমাঈল

একুশ মানে পুষ্প হাতে
নগ্ন পায়ে যাওয়া
একুশ মানে সবাই মিলে
ভাষার গান গাওয়া।

একুশ মানে শহিদ ছেলে
শুন্য মায়ের কোল
একুশ মানে কৃষ্ণচূড়া
রক্ত ঢেউয়ের দোল।

একুশ মানে চির স্মরণীয়
আত্মত্যাগের কথা
একুশ মানে কোমল হৃদয়ে
শহিদের প্রতি ব্যথা।

একুশে ফেব্রুয়ারি

দীনুল ইসলাম

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি
স্মৃতিতে থাকবে চিরদিন
আমরা শোধিতে পারিব না
শহিদদের ঋণ।

বাংলা ভাষা পেতে
যারা দিয়ে গেছেন প্রাণ
ভুলব না মোরা কখনো
তাদের এই অবদান।

এই দিনে সবার মুখে মুখে
শোনা যায় একই ধ্বনি
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
মহান একুশে ফেব্রুয়ারি।

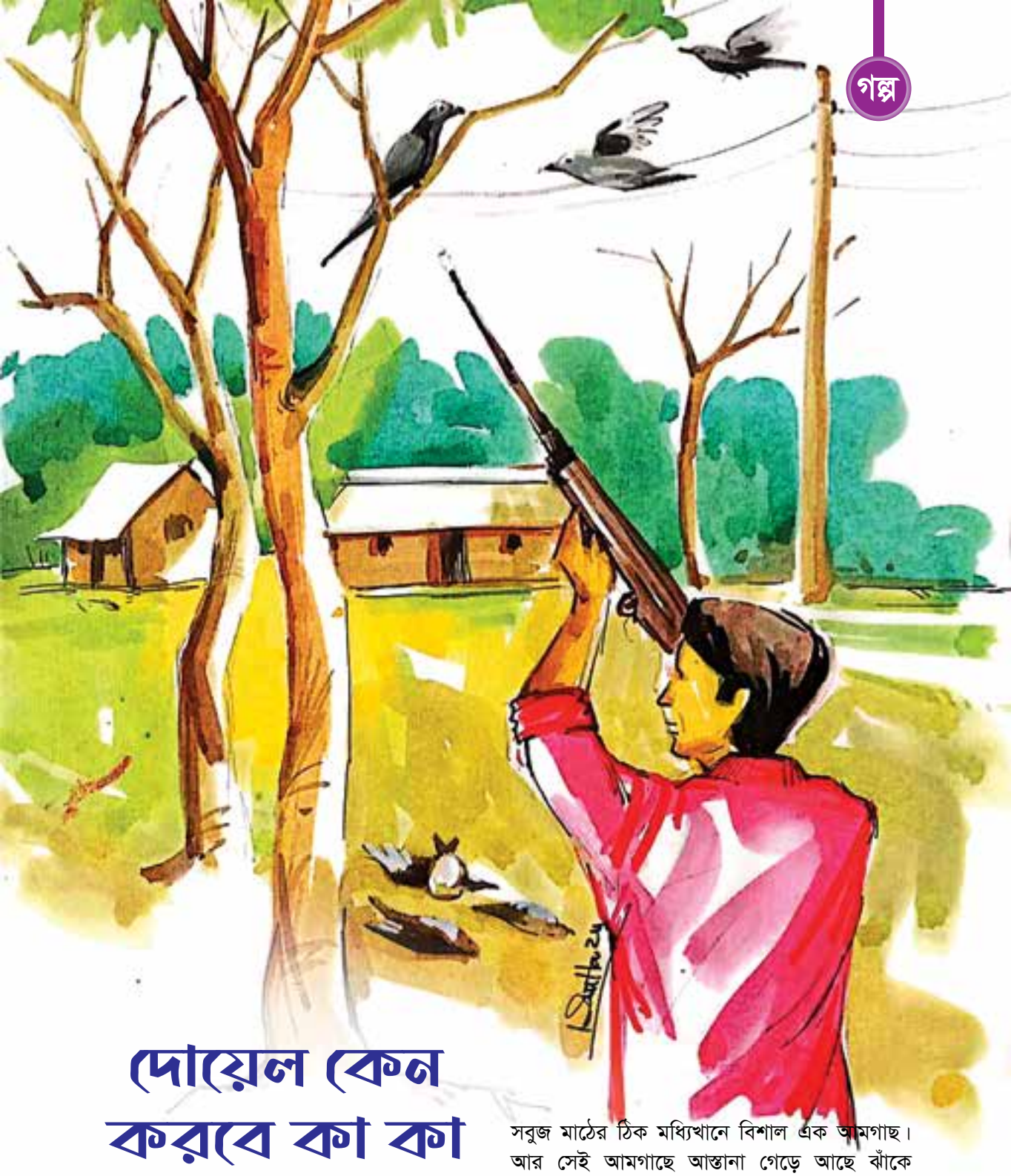

দোয়েল কেন করবে কা কা

আহমেদ রিয়াজ

সবুজ মাঠের ঠিক মধ্যিখানে বিশাল এক আমগাছ। আর সেই আমগাছে আস্তানা গেড়ে আছে ঝাঁকে ঝাঁকে দোয়েল। ছোটো দোয়েল, বড়ো দোয়েল। শিশু দোয়েল, বুড়ো দোয়েল। ছেলে দোয়েল, মেয়ে দোয়েল। সবাই দোয়েল।

সব দোয়েল মিলে সারাদিন আমগাছ মাতিয়ে রাখে। উড়ে বেড়ায়। ঘুরে বেড়ায়। ছুটে বেড়ায়। এখানে সেখানে-ওখানে। কখনো কাছে। কখনো দূরে। আর হইচই করে। নানান রকম ডাক ওদের। ট্যারেট ট্যাট ট্যাট। টি-ই-ই-ই টা টিটা ট্যা-অ্যা-অ্যা-ট।

একদিন সেই দোয়েল পাড়ায় এল বদখত চেহারার এক পাখি। এসে বসল সেই আমগাছের সবচেয়ে শক্তপোক্ত একটা ডালে। বদখত পাখিটাকে দেখেই ঘাবড়ে গেল দোয়েলরা। আর দূরে সরে গেল। দূরে গিয়ে অবাক হয়ে তাকালো সেই বদখত পাখির দিকে। থেমে গেল ওদের হইচই, নাচানাচি, খেলাধুলা।

ডালে বসেই হাঁক ছাড়ল বদখত পাখি, 'জানিস আমি কে? আমার নাম লিয়াক পাখি।'

লিয়াক পাখি!

এ ওর ঠোঁটের দিকে তাকালো দোয়েলেরা। কয়েকটা বুড়ো দোয়েল কাশতে কাশতে বলল, 'এটা আবার কেমন পাখি? এমন পাখির নাম তো কখনো শুনিনি!'

গর্জে ওঠল লিয়াক পাখি। 'কী বললে! লিয়াক পাখির নামই শোনোনি! তাহলে তো এ তল্লাটে থাকার যোগ্যতাই নেই তোমাদের।'

'কী!' বুড়ো দোয়েলরা ক্ষ্যাপে গেল ভীষণ। 'এখানে আমরা অনেকদিন থেকেই থাকি। তুমি কোথায় থাকো?'

ঘাড়টা পশ্চিমে ঘোরালো লিয়াক পাখি। তারপর বলল, 'ওই দিকে। মাঠের ওপারে।'

'বুঝেছি। ওই যে ন্যাড়া টিলাগুলো দেখা যাচ্ছে, সেদিকে তো! ওখানে তো কোনোদিন আগাছাও জন্মাতে দেখিনি!'

ঘাড় নাড়ালো লিয়াক পাখি, 'ঠিক তাই। আমি এই পুরো তল্লাটের সর্দার।'

'খুব ভালো কথা। তা এখানে কী চাই?'

'আমগাছটাও তো এই তল্লাটের অংশ, তাই আমি তোমাদের ভাষাজ্ঞান দিতে এসেছি।'

'কী জ্ঞান?'

'ভাষাজ্ঞান।'

বুড়ো দোয়েলরা বলল, 'বুঝতে পারিনি। বুঝিয়ে বলো তো লিয়াক পাখি!'

'উঁহু। সর্দারকে নাম ধরে ডাকতে নেই। নামের আগে মহামান্য বলতে হয়। বলতে হবে মহামান্য লিয়াক পাখি।'

রেগে গেল যুবক দোয়েলরা। বলল, 'অচেনা ভিনদেশি পাখিকে মহামান্য বলতে আমাদের বয়েই গেছে!'

'এজন্যই তো তোমাদের ভাষাজ্ঞান দিতে এসেছি। শোনো, এখন থেকে তোমরা আর দোয়েল ভাষায় কথা বলবে না। ওটা নীচু জাতের ভাষা। ওই ভাষায় কথা বললে ইজ্জত থাকবে না। কথা বলবে কাকের ভাষায়।'

'কাকের ভাষায় কেন?'

'কারণ কাকের ভাষাকেই এ তল্লাটের অফিশিয়াল ভাষা ঘোষণা করা হবে। পুরো তল্লাটে একটাই ভাষা থাকবে।'

মাতৃভাষা ছেড়ে কাকের ভাষা! নিজেদের মধুর ভাষা ছেড়ে কর্কশ ভাষা! এই বুঝি ভাষাজ্ঞান!

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল একঝাঁক তরুণ দোয়েল, 'না। না। না। আমরা দোয়েল। দোয়েলের ভাষাতেই কথা বলব। দেখি কে আমাদের ঠেকায়?'

তারপর সবগুলো দোয়েল তরুণ দোয়েলদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলালো, 'আমরা দোয়েল। দোয়েলের ভাষাতেই কথা বলব।'

আরে! সব দোয়েল যে এক সুরেই কথা বলছে! ভীষণ ঘাবড়ে গেল লিয়াক পাখি। কোনো রকমে একটা ঢোক গিলল। কদিন আগে কাআজি পাখিও এই সুর তুলেছিল। দোয়েলদের ভাষাজ্ঞান দিতে এসেছিল। কিন্তু পাত্তা পায়নি।

ভাগ্যিস দোয়েলরা খুব শান্তশিষ্ট পাখি। নইলে লিয়াক পাখির রেহাই ছিল না।

সুযোগ বুঝে পুচ্ছ গুটিয়ে ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল লিয়াক পাখি।

তারপর... কয়েকদিন পর।

সেই ন্যাড়া আর খটখটে পাহাড় থেকে উড়ে এল আরেকটা পাখি। এসে বসল আমগাছের একটা ডালে। আর বসেই হম্বিতম্বি শুরু করল। 'এই দুষ্টু দোয়েলের দল। তোমরা এখন থেকে কাকের ভাষায় কথা বলবে। সবাই আমার সঙ্গে বলো-কা কা কা।'

কিন্তু এ কী! কোনো দোয়েলই কা কা করল না।

রেগে গেল সেই পাখি। 'তোমরা জানো আমি কে? তোমাদের নতুন সর্দার। খানাজি পাখি। সবাই বলো, কা কা কা।'

নাহ। কোনো দোয়েল তাকে পাত্তা দিল না। আবারও চেঁচালো খানাজি পাখি, 'কা কা কা। সবাইকে কা কা করেই ডাকতে হবে। এটা আমার নির্দেশ!'

এবার ক্ষ্যাপে গেল সব দোয়েল। কিছু দোয়েল মিছিল করতে লাগল, 'মানি না মানব না। কা কা স্বরে ডাকব না।'

'মানি না মানব না। কা কা স্বরে ডাকব না।'

দোয়েলের চেঁচামেচিতে খানাজি পাখিও ঘাবড়ে গেল। ভয় পেয়ে পুচ্ছ গুটিয়ে পশ্চিমের ন্যাড়া পাহাড়ে পালিয়ে গেল।

দোয়েলরা খুব শান্তশিষ্ট পাখি। নইলে খানাজি পাখির রেহাই ছিল না।

ন্যাড়া পাহাড়ে গিয়ে রাগে গজগজ করতে লাগল খানাজি পাখি। কয়েকটা শিকারি জোগাড় করে ফেলল। শান্তশিষ্ট দোয়েলদের মিছিলে গুলি করল শিকারিরা। কয়েকটা দোয়েল লুটিয়ে পড়ল সবুজ মাঠে।

এরপর দোয়েলরা আর শান্ত হয়ে রইল না। তারা...

থাক। সে গল্প না হয় আরেকদিন।

তবে এরপর থেকে আর কেউ দোয়েলদের কা কা করে ডাকতে বলার সাহস পায়নি। আর সেই থেকে দোয়েলরা তাদের মায়ের ভাষাতেই শিষ দেয়, হইচই করে। ট্যারেট ট্যাট ট্যাট। টি-ই-ই-ই টা। টিটা ট্যা-অ্যা-অ্যা-ট। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও গল্পকার

গল্প

পাখিদেরও ভাষা আছে

মুহিবুল্লাহ কাফি

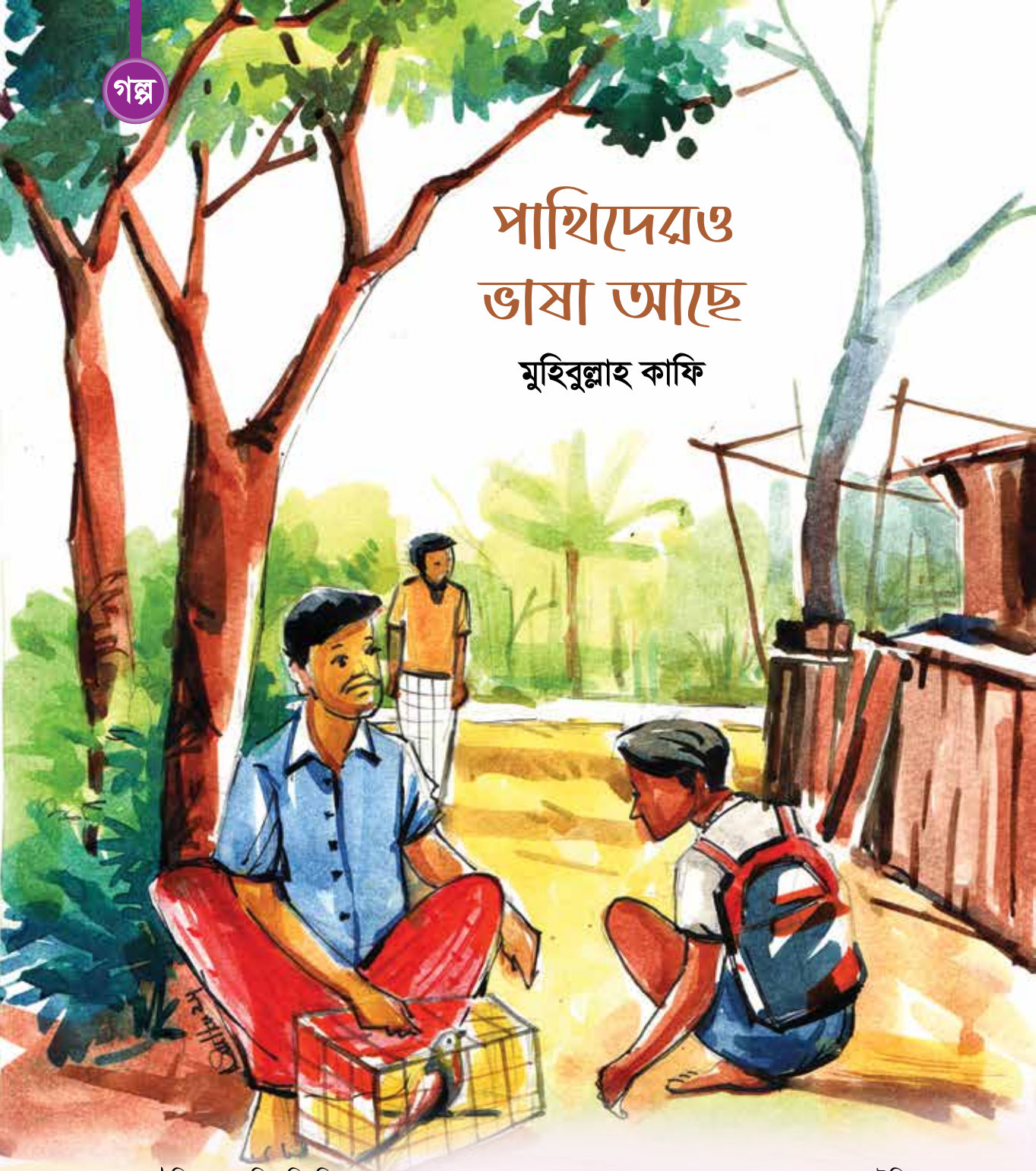

আদিল ক্লাস থ্রির নিয়মিত ছাত্র। তোমাদের মতো সেও খুব ভালো। মা-বাবার কথা শোনে। দুষ্টুমি করে না। মা-বাবাকে জ্বালাতন করে না। আদিল নিয়মিত ইশকুলে যায়। মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করে। শিক্ষকদের পড়াশোনায়। ইশকুল ছুটি হলে অযথা কোথাও সময় নষ্ট করে না। সোজা বাসায় চলে আসে। বাসায় এসে হোমওয়ার্ক করে।

আদিল প্রতিদিনের মতো আজও ইশকুল ছুটি হবার পর সোজা বাসার দিকে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ আদিল একটি পাখি দেখে থমকে দাঁড়ালো। পায়ে পায়ে ও পাখিঅলার কাছে গেল। পাখিঅলার খাঁচার ভেতর একটি পাখি আদিলকে দেখে বলতে লাগল, ময়না কথা কয় না। ময়না কথা কয় না।

আরে আশ্চর্য! পাখি কথা বলছে। পাখির কথা শুনে আদিল আনন্দে মেতে উঠল। পাখি কথা বলতে পারে, ও আগে জানত না। কী মজা, কী দারুণ! আদিল নেচে উঠল।

আদিল বাসায় এসে বাবাকে বলল, আচ্ছা বাবা, পাখিরাও কি আমাদের মতোন কথা বলতে পারে?

বাবা আদিলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, হ্যাঁ, পাখিরাও আমাদের মতন কথা বলতে পারে। কিন্তু পাখিদের কথা শেখাতে হয়। তাহলেই তারা কথা বলতে পারে।

আদিল বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে উশখুশ করতে করতে বলল, আচ্ছা বাবা, সব ধরনের পাখিকে যদি কথা বলা শেখানো হয়, তাহলে কি তারা কথা বলতে পারবে?

বাবা বললেন, সব ধরনের পাখি তো কথা বলতে পারে না।

আদিল বাবার আরো কাছে এসে বলল, তাহলে কোন কোন পাখি কথা বলতে পারে?

বাবা বলেন-টিয়া, ময়না, ঘুঘু, শালিক... এই পাখিদের কথা বলা শেখালে তবেই তারা কথা বলতে পারবে।

পাখিদের কথা শোনার জন্য আদিলের মন উড়ুউড়ু করতে লাগল। তার যেন এখন একটাই হবি, পাখিকে কথা বলা শেখানো। পাখির কথা শোনা। তাই আদিল বাবার কাছে বায়না করে বসল,

বাবা, ও বাবা আমায় একটা ময়না পাখি কিনে দাও না। আমি ময়নাকে কথা বলা শেখাবো। ময়না পাখি কথা বলা শিখে গেলে আমার সাথে কথা বলবে। কত্ত মজা হবে।

বাবা বললেন, বাবা আদিল, পাখি কেনা ভালো নয়। পাখিদের বন্দি করে রাখা গর্হিত কাজ।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। আদিল বাবার বারণ না শুনে জেদ ধরে রইল। সে মুখটা ভোঁতা করে বসে থাকল। মা-বাবার সঙ্গে কথা বলে না আদিল। ঠিকমতো খায় না। শেষমেষ আদিলকে খুশি করতে বাবা একটা ময়না পাখি কিনে আনলেন। আদিল খাঁচায় বন্দি একটা ময়না পাখি দেখে হা হা করে হেসে উঠল। বাবাকে জড়িয়ে ধরল। সে ময়না পাখি পেয়ে ভারি খুশি।

আদিল ইশকুল থেকে এসেই ময়না পাখিকে কথা শেখাতে বসে যায়। ময়না পাখিকে বলে, এই পাখি আমার সাথে সাথে বলো, ময়না কথা কয় না। ময়না কথা কয় না।

এভাবে আদিল এক সপ্তাহ ময়না পাখিকে কথা বলা শেখালো। কিন্তু ময়না পাখি একটা কথাও শেখেনি। আদিল ময়না পাখিকে কথা বলতে বললে ময়না পাখি উলটো আদিলের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তাতে আদিলের ভীষণ রাগ চড়ে যায়। সে আবার বাবার কাছে গিয়ে বলল, বাবা, ময়না পাখি তো কথা বলে না। আদিলের কথা শুনে বাবা হেসে দিয়ে বললেন, বলবে, ময়না পাখি কথা বলবে। তবে আরো দেরিতে। ময়না পাখির সামনে বারবার কথা বলতে হবে। তুমি ময়না পাখির সামনে তার নাম ধরে ডাকবে। দেখবে হঠাৎ একদিন ময়না তোমার সাথে কথা বলছে।

আদিল ময়না পাখির সামনে ঘুরে আর বলে, ময়না কথা কয় না। আদিল ময়না পাখিকে খেতে দেয় আর বলে, ময়না কথা কয় না। কিন্তু তবুও ময়না পাখিটা কোনো কথা-ই বলে না। এভাবে কিছুদিন কেটে গেল। ময়না পাখিকে আদিল কোনো কথা বলা শিখাতেই পারল না। তবুও আদিল আশা ছাড়েনি। সে ময়না পাখিকে কথা বলা শেখাবেই শেখাবে।

আদিল ইশকুলে যায়। বাসায় এসে হোমওয়ার্ক করে। ময়নাকে কথা বলা শেখায়। এভাবে কেটে গেল আরো কিছুদিন। তবুও ময়না পাখিটা একটা কথাও শিখল না।

একদিন ইশকুলে বাংলা স্যার বললেন, আগামীকাল তোমাদের ইশকুল বন্ধ।

আদিল ক্লাসে দাঁড়িয়ে বলল, কীসের বন্ধ স্যার।

স্যার বললেন, আগামীকাল বাংলা ভাষা দিবস।

আদিল আবারো বলল, আচ্ছা স্যার ভাষা দিবস কী?

এবার স্যার বলতে লাগলেন, আমাদের বাংলাদেশটা এক সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের উপর অত্যাচার করত। তাদের ভাষা ছিল উর্দু। আমাদের ভাষা বাংলা। তাই তারা আমাদের উপর উর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রভাষা উর্দু করতে চাইল। এবং তারা আমাদের ওপর ১৪৪ ধারা জারী করল। ১৯৫২ সালে আমাদের দামাল ছেলেরা এর প্রতিবাদ শুরু করল। আমাদের মায়ের ভাষা, বাংলা ভাষা রক্ষার্থে ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে দামাল ছেলেরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে দিল। তখন পুলিশবাহিনী তাদের উপর বৃষ্টির মতো গুলি ছুঁড়ল। পুলিশের গুলির আঘাতে শহিদ হলেন–সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ নাম না জানা আরো অনেকে। এভাবেই আমাদের বাংলা ভাষা অর্জিত হয়েছিল। এজন্য প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে আমাদের মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। শুধু আমাদের বাংলাদেশেই

এই দিবস পালিত হয় এমন নয়, বরং পৃথিবী জুড়ে এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়।

স্যার দীর্ঘ বক্তৃতা দেবার পর সবাইকে বললেন, তাহলে তোমরা বুঝেছ আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলা কীভাবে পেলাম? ভাষা দিবস কী বুঝেছ?

ক্লাসের সবাই বলল, জি, স্যার।

আদিল শুধু এতটুকুই বুঝেছে যে, বাংলা ভাষা অর্জন করতে অনেকে পুলিশের গুলি খেয়ে শহিদ হয়েছেন। ব্যাস, তার আবারো মনে পড়ল ময়না পাখির কথা। ইশকুল ছুটি হলে আদিল এক দৌড়ে বাসায় আসল। বসে পড়ল তার ময়না পাখিকে নিয়ে। কথা বলা শিখাতে লাগল- ময়না কথা কয় না, ময়না কথা কয় না।

ময়না সত্যি সত্যিই এখনো কথা বলেনি। আদিল সারাদিন ময়নাকে কথা বলা শেখানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। ময়না এখনো কোনো কথা বলা শেখেনি। উলটো ময়না পাখি আদিলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আদিল ময়না পাখির উপর রাগ করে রাতে ঘুমোতে গেল। ঘুমালো আদিল।

আদিল এবার ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখল তার ময়না পাখি কথা বলা শিখে গেছে। কী মজা, কী মজা! আদিল আনন্দে যেন আটখানা। এবার সে লক্ষ করল ময়না পাখিটা তাকে বলছে,

আদিল তোমাদের ভাষা বাংলা। তোমাদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানিরা উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। তারা তোমাদের উপর জুলুম-নির্যাতন করেছিল। কিন্তু তোমাদের কিছু দামাল ছেলেরা নিজেদের বিসর্জন দিয়ে বাংলা ভাষাকে অর্জন করেছিল। এক কওম-জনগোষ্ঠীর উপর অন্য কওম-জনগোষ্ঠীর ভাষাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়, খুউব পাপ। পশ্চিম পাকিস্তানিরা তোমাদের বাংলা ভাষাকে বিলুপ্ত করে তাদের উর্দু ভাষাকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, যা খুউব অন্যায়।

ময়না পাখি আদিলকে আরো বলতে লাগল, আদিল, তুমি এটা ভেবে দেখেছ কী? আমরা পাখির জাত। আমাদেরও নিজস্ব ভাষা আছে। আমরাও আমাদের মায়ের ভাষায় কথা বলি। আমরা একে অপরের সঙ্গে আমাদের মাতৃভাষায় গল্পে মেতে উঠি। আমরা স্বাধীন হয়ে উড়তে ভালোবাসি। যেথায়-সেথায় আমরা মনের আনন্দে, দুই পাখা প্রসারিত করে, স্বাধীন হয়ে উড়াই আমাদের স্বাধীনতা। কিন্তু তোমরা মানুষ আমাদের স্বাধীনতাকে হরণ করো। আমাদের উপর অত্যাচার করো। আমাদেরকে খাঁচায় বন্দি করে রাখো। আমরা নিরীহ বলে আমাদের মায়ের ভাষার ওপর তোমাদের ভাষাকে চাপিয়ে দিতে চাও। এটা কি অন্যায় নয়, অত্যাচার নয়? পশ্চিম পাকিস্তানিরা তোমাদের উপর তাদের উর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ায় তোমরা বিক্ষোভ মিছিল করেছিলে। কিন্তু আমরা তো নিরীহ। আমাদের তো বিক্ষোভ মিছিল করার শক্তি নেই। নেই সামর্থটুকু-ও।

ময়না পাখিটার চোখের কোণ দিয়ে পানি গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। ময়না পাখিটা কাঁদতে কাঁদতে আবার বলল, তোমরা মানুষ। তোমরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু তোমরা আমাদের নিরীহ পেয়ে আমাদের স্বাধীনতা হরণ করো। আমাদের ছোট্ট একটি খাঁচায় বন্দি করে রাখো। জোর করে তোমাদের ভাষা আমাদের উপর চাপিয়ে দাও। কেন, বলতে পারো? ময়না পাখিটা এবার হাউমাউ করে কান্না করতে লাগল।

আদিলের ঘুম ভেঙে গেল। মোরগ ডাকা ভোরে। আদিল তার স্বপ্নের কথা ভেবে মনটা খুব খারাপ করে নিলো। মনে মনে ভাবল, সত্যি-ই তো। আমি ময়না পাখিকে খাঁচায় বন্দি করে রেখেছি। তাকে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বাংলা ভাষা তার ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছি! এটা তো ঠিক নয়। তারও তো ভাষা আছে। তার মাতৃভাষা আছে। সেও তো মাতৃভাষায় কথা বলতে চায়। গতকাল বাংলা স্যার বলেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন করেছিল। তাদের উর্দু ভাষাকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ নাম না জানা আরো অনেকে শহিদ হয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর অনেক অন্যায়-অত্যাচার করেছিল।

আদিল এসব ভাবতে ভাবতে খাঁচাতে বন্দি ময়না পাখির কাছে গেল। এবার সে ময়না পাখিকে বলল, ময়না পাখি, তুমি স্বপ্নে আমাকে যা বলেছ একদম ঠিক বলেছ। আমি তোমার প্রতি অনেক অন্যায় করেছি। আমি আমার বাংলা ভাষা তোমার উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। যেমনটা চেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর। আমি ভুল করেছি। আমায় ক্ষমা করে দিয়ো। আজ ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ। আমাদের মাতৃভাষা দিবস। তোমাদেরও মাতৃভাষা দিবস। এই মাতৃভাষা দিবসে আমি আর তোমাকে জোর করে আমার বাংলা ভাষা শিখাবো না। তোমাকে এই ছোট্ট খাঁচায় বন্দি করেও রাখব না। আজ আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো। তুমি স্বাধীনভাবে উড়বে। তুমি তোমার মাতৃভাষায় কথা বলবে। তোমার মায়ের সঙ্গে। বন্ধুদের সঙ্গে। তোমার পাড়াপড়শিদের সঙ্গে।

আদিল ময়না পাখির খাঁচাটা নিয়ে তাদের বেলকনিতে আসল। সূর্যের মিষ্টি মিষ্টি রোদ যেন বেলকনিতে মেলা বসিয়েছে। আদিল সেই মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে খাঁচা থেকে ময়না পাখিটা বের করল। দু'হাতে ধরে ময়না পাখিকে একটা চুমু দিয়ে দু'হাত ছেড়ে দিলো আদিল। ময়না পাখি তার মাতৃভাষায় চিঁ চিঁ করতে করতে ফুড়ুৎ করে উড়াল দিলো। আদিল মুচকি হেসে তাকিয়ে রইল ময়না পাখির উড়ন্ত দুই ডানার দিকে। ময়না পাখি উড়ে গিয়ে বসল আদিলদের সামনের বিল্ডিংয়ে। তাকালো আদিলের দিকে কিছুক্ষণ। যেন আদিলকে ময়না পাখি ধন্যবাদ জানালো। এবার ময়না পাখিটা উড়ে ওই দূরে চলে গেল। আদিল চেয়েই রইল।

কিছুক্ষণ পর আদিল সবকিছু তার বাবাকে খুলে বলল। বাবা শুনে খুউব খুশি হলেন। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও গল্পকার

মির্জা মাহের আসেফ, পঞ্চম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

একুশের গান

রুমান হাফিজ

এবার প্রথম স্কুলে ভর্তি করা হলো আনিকাকে। বাসা থেকে স্কুলের দূরত্ব খুব একটা না হলেও মা শিলা আক্তার প্রতিদিন তাকে স্কুলে নিয়ে যান। স্কুলে তার মতো আরো অনেক বন্ধু পেয়ে আনিকার বেশ ভালোই লাগছে। আম্মু প্রতিদিনের পড়াটা বাসায় শিখিয়ে দেন। আনিকা বেশ আগ্রহ নিয়েই পড়া শিখে।

আনিকার আব্বু প্রবাসে থাকেন। বাসায় বড়ো ভাইয়া, আম্মু আর দাদু। বড়ো ভাইয়াকে বাসায় একদমই পায় না বললেই চলে। একমাত্র দাদুই তার ভরসা। আগে যখন আনিকা স্কুলে ভর্তি হয়নি তখন দাদুর কাছেই সব সময় পড়ে থাকত। দাদু তাকে অনেক আদর করেন। আর এখন, স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে দাদুর কাছে আসার সময়ই পাচ্ছে না। তবে দাদু তার আদরের নাতনিটার খোঁজ রাখতে একদম ভুলে যাননি।

আনিকার আব্বু ফোন দিলেন সেদিন। দাদুর সাথে কথা বলার পরে আনিকার কাছে ফোন দেওয়া হলো। আব্বুর সাথে ফোনে কথা বলতে বলতে আনিকার মনে হচ্ছে আব্বুর কোলে একদম কাছাকাছি বসে কথা বলছে। কীভাবে স্কুলে যায়, বন্ধুদের সাথে কেমন মজা হয়, স্যারেরা কেমন আদর করেন ইত্যাদি বলতে থাকে আনিকা।

এক পর্যায়ে আনিকা আব্বুকে প্রশ্ন করে বসে। আচ্ছা আব্বু, তুমি কেন আমাকে স্কুলে নিয়ে যাও না?

মেয়ের প্রশ্ন শুনে আব্বু হেসে দিলেন। আরে বোকা মেয়ে, আব্বু তো অনেক দূরে আছি তাই না? কীভাবে নিয়ে যাব?

আচ্ছা আব্বু দেশে আসি তারপর তোমাকে নিয়ে স্কুলে যাব, কেমন?

-জি আচ্ছা আব্বু।

আনিকা বুঝতে পারে তার আব্বু তো বিদেশে থাকেন। তাহলে কীভাবে নিয়ে যাবেন?

বছরের প্রথম দিকে আনিকাদের স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া সপ্তাহের আয়োজন করা হয়। সব ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের জন্যও রয়েছে অংশগ্রহণ করার সুযোগ। আনিকাও তাদের ছোটোদের বিভাগের এ কয়েকটিতে অংশ নিয়েছে। যার মধ্যে চিত্রাঙ্কন, গান এবং কবিতা আবৃত্তি।

আনিকাদের ক্লাস টিচার মিনহাজ ফয়সল সাহেব তাদের সবার উদ্দেশ্যে বললেন, এ বছর সপ্তাহব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে একুশে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ যেদিন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। স্যারের ঘোষণা শুনে সবাই হাততালি দিতে লাগল। স্যার সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আচ্ছা তোমরা কি কেউ বলতে পারবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটা কী?

ক্লাসের সবাই চুপ করে রইল। আচ্ছা, অসুবিধে নেই আমি বলছি তোমরা সবাই মন দিয়ে শুনবে, কেমন?

-জি স্যার। সমস্বরে সবাই বলে উঠল।

আমাদের এই বাংলা ভাষাকে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কেড়ে নিতে চেয়েছিল এবং উর্দুকে আমাদের ভাষা হিসেবে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের সেই চাওয়াকে মেনে নিতে পারেনি আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণ। ছাত্র-শিক্ষক থেকে শুরু করে সবাই এর বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ শুরু করে। বাংলা ভাষার সেই দাবিকে দমিয়ে রাখতে তারা একশত চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে, কিন্তু আমাদের দেশের অকুতোভয় লড়াকু ছাত্রজনতা তা ভেঙে মিছিল বের করে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে তারা দৃপ্তকণ্ঠে স্লোগান তুলেছিল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।

সেই মিছিলে পাকিস্তানি পুলিশ গুলি ছুঁড়তে শুরু করলে একে একে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ আরো অনেকেই প্রাণ হারান। তাদের রক্তে সেদিন পিচঢালা পথটা লাল হয়েছিল কৃষ্ণচূড়ার মতো। বিশ্বের একমাত্র ভাষা, যার স্বীকৃতির জন্য এদেশের মানুষ প্রাণ দিয়েছিল। তাদের সেই আত্মত্যাগকে পুরো বিশ্ববাসী আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। আর সেজন্যই এই দিনটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের আত্মত্যাগের কারণেই তো আজ আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারছি। ঠিক না?

-জি স্যার! (সবাই একসাথে বলে উঠল)

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে আনিকা। আম্মু তাকে রেডি করে দিয়ে নাশতা খেতে দিলেন। রাতে ভাইয়া ফুল নিয়ে এসেছিল আনিকার জন্য। কারণ আনিকা আগেই ভাইয়াকে বলে রেখেছে একুশে ফেব্রুয়ারিতে সে স্কুলের শহিদমিনারে ফুল দেবে। সবকিছু ঠিকঠাক করে আম্মুর সাথে রওয়ানা দেয় স্কুলের উদ্দেশ্যে।

স্কুলে এসেই শহিদমিনারে ফুল দেয় আনিকা। কি যে খুশি লাগছিল তার।

নির্ধারিত সময়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হলো। একে একে সবাই এসে উপস্থিত হলেন। এবার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করতে লাগলেন উপস্থাপক। 'ছোটোদের বিভাগে গানে প্রথম হয়েছে আনিকা বুশরা মারয়ামা'।

নিজের নাম শুনতে পেয়ে আনিকার সে কি খুশি, ভাবতেই পারছে না সে কীভাবে প্রথম হলো। উপস্থাপক এবার আনিকাকে মঞ্চে এসে পুরস্কার নেওয়ার জন্য আহবান করলেন। পুরস্কার নিয়ে চলে আসবে এমন সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা তাসনিম মিস আনিকাকে বললেন একটা গান শুনাতে। ম্যাডামের কথায় একেবারে 'থ' হয়ে যায় আনিকা। মনে মনে ভাবতে থাকে কীভাবে এত বড়ো অনুষ্ঠানে সে একা গান গাইবে। ঠিক তখনি আনিকার হাতে মাইক্রোফোন ধরিয়ে দেন উপস্থাপক। কাঁপা কাঁপা হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে আনিকা গান শুরু করে, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি,আমি কি ভুলিতে পারি..?'

আনিকার সুললিত কণ্ঠের গান অনুষ্ঠানের সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আকর্ষণ করে। পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছিল তখন পুরো অনুষ্ঠানস্থলে। গান শেষ হতে না হতেই মুহুর্মুহু করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল গোটা আঙিনা.....। ❑

শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা ভাষা

শাকিলা ইয়াসমিন

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
আমার অহংকার
বাংলা আমার প্রাণের ভাষা
আমার অলংকার।

এই ভাষাতেই বাউল- মাঝি
হৃদয় খুলে গায়
জারি-সারির মধুর সুরে
মন ভরে যায়।

এ ভাষাতেই আমের ডালে
কোকিল গায় গান,
কলকল শব্দে ছুটে চলে
নদীর কলতান।

এই ভাষাতেই চাষি ভাই
গান গেয়ে জমি করে চাষ
রোদে পুড়ে জলে ভিজে
ফলায় ফসল বারোমাস।

অষ্টম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

মাতৃভাষা

অমিত কুমার কুণ্ডু

মায়ের মুখে, ভায়ের মুখে, বাবার মুখে বাংলা ভাষা
চাষির বুকে ফসল বোনার স্বপ্ন সুখে বাংলা ভাষা
হৃদয় জুড়ে গানের সুরে প্রাণের বাংলা ভাষা
জেলের জালে, মাঝির পালে বাউল গানে বাংলা ভাষা।

ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতায় স্বদেশ চেনার বাংলা ভাষা
জাতির পিতার বীর শহিদের মুক্তিসেনার বাংলা ভাষা
দোদুল দোলায় কষ্ট ভোলায় নদীর বাঁকে বাংলা ভাষা
মধুর চাকে, পাখির ডাকে, পাতার ফাঁকে বাংলা ভাষা।

সুবোধ-অবোধ, খোকা-খুকু, শিশুর পড়ায় বাংলা ভাষা
কাব্য-কথায় আঁকার খাতায় ছন্দ ছড়ায় বাংলা ভাষা
দূর পরবাস মাতৃভূমির স্মৃতিকথার বাংলা ভাষা
রবি ঠাকুর, কাজী নজরুল, প্রীতিলতার বাংলা ভাষা।

হৃদয় জুড়ে জাগায় আশা মেঘ শ্রাবণের বাংলা ভাষা।
সাগর, পাহাড়, ঝরনাধারা, সোনার ধানের বাংলা ভাষা।

ঝাঁকে ঝাঁকে অতিথি

এম ইব্রাহীম মিজি

শীতের সকাল ঝাঁকে ঝাঁকে
আসছে পাখি জলের বাঁকে,
খালে-বিলে কিংবা ঝিলে
বাঁধছে বাসা সবাই মিলে।

পাখিগুলো শীতের শোভা
আগমনের রয় যে তিথি,
তাও কেন যে ওদেরকে হায়
ডাকছি সবাই হে অতিথি!

বিদায় কালে কষ্ট হলেও
গরম এলেই যায় যে চলে,
স্থায়ী বসত নয়ত এদেশ
তাই ডাকি অতিথি বলে।

যে নাম ধরেই হোক না ডাকা
নিবেদন এই শোনো শোনো,
খেয়াল রেখো ওদের প্রতি
পায় না যেন আঘাত কোনো।

প্রাণের ভাষা বাংলা ভাষা

দেওয়ান বাদল

প্রাণের ভাষা বাংলা ভাষা,
এই ভাষাটার নদী
চর্যাপদের ঘাট পেরিয়ে
বইছে আজ অবধি।

মধুসূদন-রবী-নজরুল-
জীবনানন্দ পাঠ,
এই নদীরই বাঁকে বাঁকে
আরো কত ঘাট।

এই নদীটার গতিরোধে
ষড়যন্ত্রের ফাঁদ,
প্রতিবাদের বানে ভাঙে
উর্দুর দেওয়া বাঁধ।

শ্রদ্ধা

মো. সাকিবুল ইসলাম

বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে
আনল যাঁরা মুখের ভাষা
তাঁদের প্রতি রইল মোদের
অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

নানান ফুলে ফুলে ভরে যায়
২১শে ফেব্রুয়ারিতে শহিদমিনার
যুগ-যুগান্তর থাকুক তাঁদের প্রতি
হৃদয়ে ভালোবাসার দুয়ার।

অষ্টম শ্রেণি, মোহাম্মদপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মুরাদনগর, কুমিল্লা

একুশে ফেব্রুয়ারি

নাছরিন জাহান রূপা

একুশে ফেব্রুয়ারি
রক্তে ভেজা একটি নাম
এই দিনে ভাষার জন্য
দিয়েছিল হাজারো প্রাণ।

একুশে ফেব্রুয়ারি
শোকে দিন, বেদনার দিন
কোনো দিনও শোধ হবে না
শহিদদের রক্তের ঋণ।

শহিদমিনারে সুচি

শাম্মী তুলতুল

আগামীকাল ২১শে ফেব্রুয়ারি এই দিনে পিচ্চি সুচির স্কুল বন্ধ। সুচি পড়ে ক্লাস ফোরে। স্কুল বন্ধ হলেই সুচি ট্যা ট্যা করে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার। রাতের বেলা খেতে বসে সুচি বাবাকে বলল, আব্বু আব্বু কাল স্কুল বন্ধ আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে।

বাবা বলেন, নিশ্চয়ই যাবে।
মা বলেন, স্কুল বন্ধ হলেই তোমার বেড়ানো বেড়ে যায় তাই না?
ওমা সেকি কাল আমার বন্ধুরা সবাই বেড়াতে যাবে। কাল যেন কী হয়েছিল, উমম উমম করে সুচি গালে হাত দিয়ে চিন্তা করতে থাকে, কাল কী হয়েছে তা সুচির মুখে বার বার আটকায়।
মুহূর্তে বাবা বললেন, কাল ২১শে ফেব্রুয়ারি।
সাথে সাথেই সুচি বলল, জি জি আব্বু এটাই।
বলো না আব্বু ২১শে ফেব্রুয়ারি কী হয়েছিল?
কী হয়েছে তা কাল সকালে বলব। আজ তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া করে ঘুমিয়ে যাবে। সকালবেলা আমরা রওয়ানা দিবো।
সুচি মাথা নেড়ে সায় দিলো।
পরেরদিন অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারির দিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে গেল সুচি। উঠেই বাবাকে ডেকে দিলো। তারা বাবা মেয়ে একসাথে তৈরি হয়ে গেল। মা নাশতা করতে বললে বাবা বলেন, আজ আমরা বাইরে খাবো। সারাদিন ঘুরব। মা শুনে হাসে। সুচি বলে, আব্বু আমি বেলুন নিবো আর আইসক্রিম খাবো।
হ্যাঁ অবশ্যই খাবে।
তারা তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। সুচি বাবার হাত ধরে হাটে আর বলে এটা কী, ওটা কী? চারপাশে যা দেখে তা জিজ্ঞেস করে একে একে। ছোটোদের জানার কোনো শেষ নেই। প্রতিটা ব্যাপারে ওদের আগ্রহ অনেক বেশি। তাই পরিবারের সদস্যদের উচিত তাদের সব প্রশ্নের উত্তর সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়া। তাদের এড়িয়ে না চলা। এতে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ে।
সুচির বাবাও সবকিছু সুচিকে গুছিয়ে -বুঝিয়ে বলেন। অনেকক্ষণ হাঁটল তারা। সুচি এর মধ্যে আইসক্রিম খেলো। বেলুন কিনল। তারা হেঁটে চলে এল শহিদমিনারের কাছে। বাবা শহিদমিনারের দিকে তাকিয়ে সুচিকে বললেন, জানো এটির নাম কী ?
কী নাম আব্বু?
এর নাম হলো শহিদমিনার।
সেটা আবার কী ?
১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে নিহত শহিদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার উদ্দেশে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের প্রাঙ্গণে এই সৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়। যা বর্তমানে 'শহিদমিনার' নামে পরিচিত ।
ভাষা আন্দোলন কী আব্বু ?
ভাষা আন্দোলন হলো, এই যে তুমি, আমি যে ভাষায় কথা বলছি এটাই ভাষা। এটার জন্যই আন্দোলন করেছে আমাদের দেশের মানুষেরা। বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন করেছে। একে মাতৃভাষাও বলে। মানে মায়ের ভাষা। পরিশেষে বলা যায়, এই ভাষার জন্য যে যুদ্ধ হয়েছিল তাই হলো ভাষা আন্দোলন। শোনো এবার আর একটু বুঝিয়ে বলি। আমাদের দেশে কিছু শত্রু ছিল। তারা চায়নি আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি। কারণ তারা ছিল উর্দুভাষী। ১৯৪৭ সালের ব্রিটিশভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পাকিস্তানের দুটি অংশ। পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত দিক থেকে অনেক পার্থক্য বিরাজ করছিল। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ ঘোষণার কারণে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকারী বাংলাভাষী সাধারণ মানুষ খুব কষ্ট পায়। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী মানুষ আকস্মিক এমন সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেননি। ফলস্বরূপ বাংলা ভাষার সম-মর্যাদার দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলন দমনে পুলিশ ঢাকা-শহরে সমাবেশ-মিছিল ইত্যাদি বেআইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।
কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সংখ্যক ছাত্র ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন ১৩৫৮) এ আদেশ অমান্য করলে পুলিশ তাদের ওপর গুলি ছোড়ে। গুলিতে নিহত হন বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের ছেলে রফিক, তেজোদীপ্ত তরুণ সালাম, এম. এ. ক্লাসের ছাত্র বরকত, আব্দুল জব্বারসহ আরো অনেকে। ভাষা আন্দোলনের শহিদ স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাতারাতি ছাত্রদের দ্বারা গড়ে ওঠে শহিদমিনার। যা ২৪শে ফেব্রুয়ারি উদ্‌বোধন করেন

শহিদ শফিউর রহমানের পিতা। ২৬শে ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শহিদমিনারের উদ্‌বোধন করেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

এভাবেই যুদ্ধে হেরে গিয়ে অবশেষে শত্রুরা ভয় পেয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা আমাদের দিয়ে দেয়। ১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি শহিদমিনারের পরিকল্পনা, নির্মাণকাজ ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের উদ্যোগে সম্পন্ন হয়। বর্তমানে শহিদমিনারের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শহিদের রক্ত ভেজা স্থানে সাড়ে ১০ ফুট উঁচু এবং চওড়া ভিত্তির ওপর ছোটো স্থাপত্যটির নির্মাণ কাজ শেষ হলে এর গায়ে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ লেখা একটি ফলক লাগিয়ে দেওয়া হয়। নির্মাণের পরপরই এটি সবার নজরে আসে। তখন থেকেই প্রতি বছর এখানে দলে দলে হাজার হাজার মানুষ খালি পায়ে ভাষা শহিদদের প্রতি সম্মান জানাতে ফুল হাতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আর গানের সুরে সুরে বলেন 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি...'। বুঝতে পেরেছ? আর ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেলে 'শহিদমিনার' আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার প্রতীক স্বরূপ হয়ে ওঠে।

কত কথা জানলাম আব্বু। আজ না এলে সরাসরি শহিদমিনারও দেখা হতো না আর এর ইতিহাসও জানা হতো না। খুব ভালো করেছ আব্বু আমাকে নিয়ে এসে।

সবার মতো আমরাও ফুল দিব না আব্বু?

হ্যাঁ অবশ্যই দিব। চলো কিছু ফুল কিনে নিয়ে আসি।

খালি পায়ে ফুল দিয়ে আসব।

খালি পায়ে কেন আব্বু?

খালি পায়েই শহিদমিনারে উঠতে হয়। শহিদদের খালি পায়েই শ্রদ্ধা জানাতে হয়। জুতা পরে উঠলে তাদের অসম্মান করা হবে। মনে থাকবে?

আজ থেকে প্রতি ২১শে ফেব্রুয়ারির কথা আমার মনে থাকবে আব্বু । আমি প্রতি বছর ফুল দিতে আসব।

নিশ্চয়ই আসবে। কথা শেষ করে তারা দুজন ফুল দিতে শহিদমিনারে চলে গেল। ❑

গল্পকার ও আইনজীবী

বই

শাহীন খান

বইমেলায় বই যেন সুরের লহর
সারি সারি বই যেন জ্ঞানের বহর।
হৃদয়ের হৃদয় বৃন্তে ফুটে হাজার ফুল
বইমেলায় সকলে আজ আনন্দে মশগুল।

বই আর বই চারিদিকে দেখি বই
বই পড়ে জ্ঞান নিয়ে ভালো মানুষ হয়।
মহতেরা বেঁচে থাকে বইয়ের মাঝে
জ্ঞানের আকাশে তারা হয়ে ছুটে।

শীতের পিছে পিছে বইমেলা আসে
বই নিয়ে শিশুরা আনন্দে মাতে।
পাঠকেরা ভালোবেসে বই নেয় কিনে
নতুন নতুন বই নিয়ে প্রকাশনা সাজে।

বই পড়ে কেউ দেওলিয়া হয় না
মন দিয়ে বই পড়ো বই জ্ঞানের আয়না।
মুখরিত গান, মান অভিমান
নতুন বই আনে জীবনে নতুন প্রাণ।

ছোটোদের লেখা

আমাদের মুখের ভাষা

ফাতেমা জান্নাত

‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি’? অমর একুশে আমাদের জাতিসত্তা ও জাতীয় ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম মাইলফলক। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটি যুগপৎভাবে বেদনার অশ্রু আর প্রেরণার আনন্দে ভাস্বর। একুশে আমাদের ভাষা শহিদ দিবসই নয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসও বটে।

নিজের মায়ের ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পৃথিবীতে কোনো দেশের কোনো কালে বাঙালির মতো বুকের রক্ত দিতে হয়নি। তাই তো বাঙালির শোকের ব্যথ ার, এই অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে সম্মানের সাথে ইউনেস্কো স্বীকৃতি দিয়েছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠে। তখন ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রস্তাব করেন বাংলা ভাষার। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মনিঅর্ডার ফর্ম, ডাকটিকিট এবং মুদ্রায় ইংরেজি এবং উর্দু ব্যবহৃত হতে শুরু করে যা বাঙালির মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করে। এই সময় পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা, আরবি হরফে বাংলা লেখা ইত্যাদি ব্যাপারে সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রের প্রচারণা শুরু করে দেন। বাংলা উপেক্ষিত হচ্ছে দেখে ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের সংবিধান তৈরির জন্য গণপরিষদের প্রথম বৈঠক বসে। এই বৈঠকে শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলা ভাষাকে সংবিধানের ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, পূর্ব বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন, প্রস্তাবটি গ্রাহ্য হয় না।

ভাষার অধিকারের জন্য জনগণের সংগ্রাম ও অতুলনীয় ত্যাগ অকস্মাৎ এসে হয়নি। দেশ বিভাগের পরেই এদেশে এই সংগ্রাম শুরু হয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে একটি জাতিকে অবদমিত করে রাখার বিরুদ্ধে এই তীব্র আন্দোলন সংঘটিত হয়। ভাষার দাবি আদায়ের সংগ্রাম ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে পরিণতি লাভ করলেও এর সূচনা হয়েছিল ১৯৪৮ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর urdu and urdu alone shall be state language of Pakistan ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদের পর পর।

পরবর্তীতে এই আন্দোলন আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। স্বেচ্ছাচারী সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি ভঙ্গ করে রাজপথে নামলে পুলিশ নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করে। এতে ভাষা শহিদ সালাম, রফিক, জব্বার, বরকতসহ আরো অনেকে শহিদ হন। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের কথা সারা বাংলাদেশ ছড়িয়ে পড়ে এবং জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। আতঙ্কিত সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। এভাবে অনেক ত্যাগ ও সংগ্রামের বিনিময়ে বাংলা ভাষা অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায়।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের খবর দেশে পৌঁছে যায় এবং দেশবাসী প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সাথে সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধানগণ পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে পূর্ব বাংলার ভাষার দাবি মেনে নেওয়ার জন্য অনবরত চাপ দিতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৫ সালের সংবিধানে সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে বাঙালি জাতির প্রাণের আবেগ এবং উচ্ছ্বাসই তাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় নিয়ে যায়। ১৯৯২ সালে ভারতের বাংলাভাষী রাজ্য ত্রিপুরা ঘোষণা করে, তাদের রাজ্যে তারা একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষা দিবস হিসেবে পালন করবে। পরে পশ্চিম বাংলায় ও বেসরকারিভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে সর্বপ্রথম সচেষ্ট হন কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম। এ দু'জনসহ কয়েকজন মাতৃভাষা প্রিয় ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'মাদার ল্যাংগুয়েজ অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড' নামক সংস্থা। ১৯৯৮ সালে এ সংস্থার পক্ষ থেকে একুশে ফেব্রুয়ারিকে

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের কাছে আবেদন পাঠানো হয়। অবশেষে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাবটি জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কো ৩১তম অধিবেশনের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। একুশের সংগ্রাম শুধু ভাষা সংরক্ষণের সংগ্রাম ছিল না। ভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট জীবনবোধ সংরক্ষণ, সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ, বাধা-বিপত্তির মধ্যেও যে আমরা আমাদের মাথা সোজা রাখতে সক্ষম, সেই ঘোষণার মূর্ত প্রতীকও একুশে ফেব্রুয়ারি। কোনো অন্যায় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরই হলো একুশে ফেব্রুয়ারি। ভাষা একদিকে যেমন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, অন্যদিকে তেমনি তার স্বপ্নসাধ পূর্ণ করার নির্দেশকও। ভাষায় যেমন কোনো জাতির অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য মূর্ত হয়ে ওঠে তেমনি ভবিষ্যতের নির্দেশ দানেও সহায়তা করে।

প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা ভাষা শহিদদের আত্মার শান্তি এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শহিদদের বেদিতে শ্রদ্ধাভরে ফুল অর্পণ করি। মাতৃভাষাকে আশ্রয় করেই একটি জাতি লালিত ও বিকশিত হয়। জাতির ভাবনা, কল্পনা, আত্মার আকুলতা-ব্যাকুলতা, হৃদয়ের প্রেম-ভালোবাসা মাতৃভাষার মাধ্যমেই রূপায়িত হয়। আর এই মাতৃভাষাকে যারা কেড়ে নিতে চায়, রক্তের বিনিময়ে হলেও তাদের প্রতিহত করতে হয়। তারই ইতিহাস গড়েছিল আমাদের দামাল ছেলেরা। আমাদের এই গৌরবগাঁথা ইতিহাসটিকে শুধু আমরা নই, বিশ্ববাসীও পালন করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। ❑

অষ্টম শ্রেণি, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মালিহা তাবাস্‌সুম, ৭ম শ্রেণি, ভিকারুন নিসা নূন স্কুল, ঢাকা

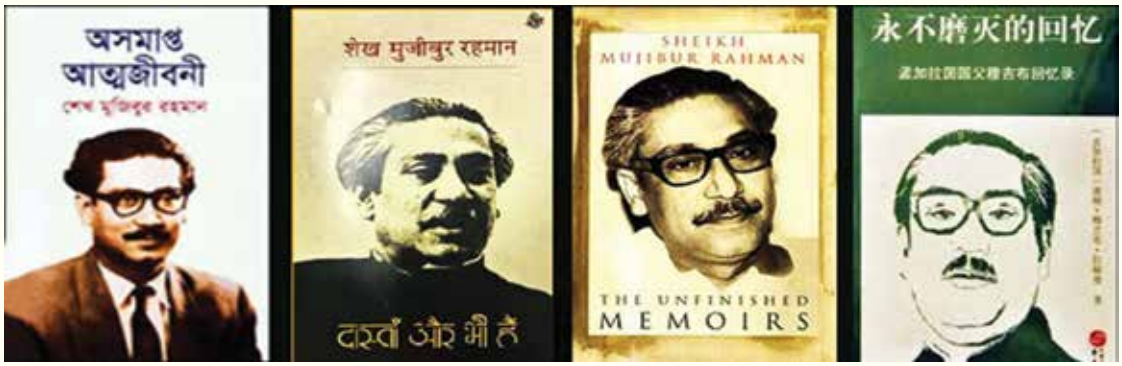

বিভিন্ন ভাষায় অসমাপ্ত আত্মজীবনী

রুবাইয়াত ইসলাম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা চারটি খাতা আকস্মিকভাবে ২০০৪ সালে খুঁজে পান বঙ্গবন্ধুর বড়ো মেয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। খাতাগুলো ছিল অনেক পুরনো, পাতাগুলোও জীর্ণপ্রায় এবং লেখা প্রায় অস্পষ্ট। মূল্যবান ওই খাতাগুলোই বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'। যা তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায় লেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। ২০১২ সালে অসমাপ্ত রেখেই তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশের পর বেশ কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয় বইটি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত কারাগারে বন্দি অবস্থায় এই অমূল্য দলিল রচনা করেন। তাঁর লেখা এই স্মৃতিকথা ২০১২ সালের ১৮ই জুন বাংলায় 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' নামে প্রকাশিত হয়। বইটির প্রথম প্রকাশনার সার্বিক দায়িত্ব পালন, তত্ত্বাবধান ও কার্যক্রম পরিচালনা করেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। বইটি প্রকাশ করে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল)।

বাংলার পাশাপাশি 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র ইংরেজি অনুবাদ 'আন ফিনিসড মেমোরিজ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম।

ইংরেজি ভাষায় 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' প্রকাশের পর বাংলাদেশ-ফ্রান্স কূটনৈতিক সম্পর্কের ৪৫তম বার্ষিকীতে প্যারিস থেকে ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ থেকে বইটির ফরাসি সংস্করণ প্রকাশনার সব কিছু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

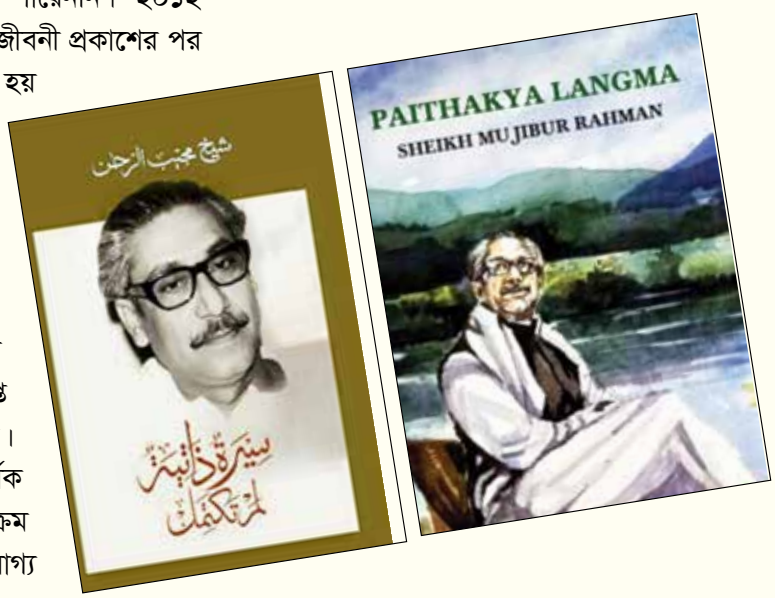

ত্বকী তাহমিদ রিহিন, পঞ্চম শ্রেণি, উইলস্ লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

ফরাসি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান জিংকো এডিটর ফরাসি সংস্করণ প্রকাশ করে। বইটি অনুবাদ করেন প্রফেসর ফ্রান্স ভট্টাচারিয়া। ফরাসি সংস্করণের পাদটীকা লিখেছেন ইনালকোতে বাংলা ভাষা ও সভ্যতার শিক্ষক জেরেমি কদ্রন।

ফরাসি সংস্করণের প্রকাশক মি. রেনালদ মনের মতে, 'অসমাপ্ত আত্মজীবনীর সাহিত্যিক মান ও ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনায় বইটি ফ্রান্সের সাধারণ পাঠক সমাজ এবং ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হবে।'

চীনা ভাষায়ও অনূদিত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'। চীনের সাবেক রাষ্ট্রদূত চাই শি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বইটির অনুবাদ করেন। বইটি অনুবাদ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে চাই শি বলেন, 'আমার মনে হয়, আমি একটি ভালো কাজ করেছি। আমি কয়েক বছর পর এসে দেখলাম বাংলাদেশের অনেক উন্নতি হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে মোড়ক উন্মোচন হয় হিন্দি ভাষায় অনূদিত বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির পিতার আত্মজৈবনিক গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

২০১৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর আরবি ভাষায় অনূদিত বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. রিয়াদ এন.এ. মালকি।

বইটির জাপানি অনুবাদক জাপান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের (এনএইচকে) বাংলা বিভাগের কাজুহিরো ওয়াতানাবে। জাপানের অভিজাত প্রকাশনা সংস্থা আশাহি সোতেন জাপানি ভাষায় অনূদিত এই বইটি প্রকাশ করে। এছাড়াও 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' স্প্যানিশ ও উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ❑

প্রাবন্ধিক

ইশারা ভাষার কথা

মো. জোবায়ের হোসেন

মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে মুখের ভাষা অর্থাৎ কথা দিয়ে। কিন্তু বন্ধুরা, আমাদের মাঝে কিছু মানুষ আছেন যারা মুখের ভাষা বা শব্দ করে কথা বলতে পারেন না। তাদেরকে আমরা বলি বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তারা যে মাধ্যমে কথা বলে তাকে বলে ইশারা ভাষা। যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ। একে সাংকেতিক ভাষা বা প্রতীকী ভাষাও বলা হয়ে থাকে। এ ভাষা শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধী মানুষের জন্য জরুরি। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষ করে হাত ও বাহু নাড়ানোর মাধ্যমে ভাব আদান-প্রদান করে। মুখের ভাষায় যোগাযোগ করা অসম্ভব বা অযাচিত হলে এ ভাষা ব্যবহার করা হয়। যেহেতু শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধী মানুষ ইশারার মাধ্যমে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে থাকেন। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ইশারা ভাষা রয়েছে। যেমন- আদিবাসী ইশারা ভাষা, নৃতাত্ত্বিক ইশারা ভাষা। বাকপ্রতিবন্ধীদের ভাষার ব্যাপারে চার হাজার চিহ্ন আছে।

তাই তাদের এ ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রতি বছর ৭ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে পালিত হয় 'বাংলা ইশারা ভাষা দিবস'। জরিপে জানা যায়, আমাদের দেশে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ কানে শুনতে পায় না, কথাও বলতে পারে না। বাংলাদেশে প্রথম ১৯৬৩ সালে কয়েকজন

শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি গড়ে তোলেন (ডিপিও) ডিজঅ্যাবল পারসন অর্গানাইজেশন।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিবন্ধী মানুষ ও ইশারা ভাষার প্রতি আছে গভীর ভালোবাসা । তাই তো তিনি ২০০৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদবোধনকালে বাংলা ইশারা ভাষাকে অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতির ঘোষণা দেন। ওই বছরের ৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি বাংলা ইশারা ভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে ২০১২ সালের ২৬শে জানুয়ারি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ৭ই ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলা ইশারা ভাষা দিবস হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

৭ই ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারিভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এসব অনুষ্ঠানে এ ভাষা ব্যবহারকারীরা অংশগ্রহণ করে থাকে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রযোজনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ ইশারা ভাষায় ধারণ করা হয়েছে। দেশের টিভি চ্যানেল ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ইশারা ভাষায় সংবাদ পরিবেশনসহ বিভিন্ন তথ্য প্রচার করছে। এছাড়া বিভিন্ন বড়ো অনুষ্ঠানেও দেখা মিলে ইশারা ভাষার দোভাষীদের। যেমন- কোনো অনুষ্ঠান, ভাষণ বা সম্মেলনে শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বোঝার জন্য অনেক সময়ই একজন ইশারা ভাষার দোভাষী রাখা হয়।

ইশারা ভাষার ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ জাতীয় বধির সংস্থা বাংলাদেশের শ্রবণ প্রতিবন্ধী মানুষের সংস্থাগুলোর উন্নয়নে কাজ করছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বেশ কিছু সংস্থা আছে যারা ইশারা ভাষা শেখানোর বিভিন্ন ট্রেনিং করান। বাংলাদেশ জাতীয় বধির সংস্থা, বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মেয়াদে ইশারা ভাষা প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। ❑

প্রাবন্ধিক

রাহি সরকার রুহী, নার্সারি শ্রেণি, ব্রাইটন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর

ভাষা বাঁচানোর লড়াই

আব্দুছ ছালাম

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে ২০১৪ সালের করা বাংলাদেশ নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ১৪টি ভাষা বিপন্ন ভাষার তালিকায় রয়েছে। তার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ছয়টি বিপন্ন ভাষার মধ্যে রেংমিটচ্য একটি। ভাষা বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, রেংমিটচ্য ভাষার এ ছয়জন লোক মারা গেলে পৃথিবী থেকে আরেকটি ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

বর্তমানে মাত্র ছয়জন রেংমিটচ্যভাষী জীবিত রয়েছেন এখন যাদের অধিকাংশই ষাটোর্ধ্ব বয়সের। তারা হলেন- আলীকদম সদর উপজেলার সদর ইউনিয়নের ক্রাংসিং পাড়ার বাসিন্দা মাংপুং ম্রো (৬৯), কুনরাও ম্রো (৭২) ও আরেকজন কুনরাও ম্রো (৬২) এবং নোয়াপাড়া ইউনিয়নের মেনসিং পাড়ার বাসিন্দা থে য়াই লক ম্রো (৫৭)। অন্য দুজন হলেন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ওয়াইবট পাড়ার রেংপুং ম্রো (৫৪) ও সাংপ্লু পাড়ার মাংওয়াই ম্রো (৬৫)। ভাষাবিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, এই মানুষগুলো মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে রেংমিটচ্য ভাষা! অবশেষে আলোর দেখা মিলেছে। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর শ্রুতির আড়ালে থাকা ভাষাটিকে বাঁচাতে শুরু হয়েছে রেংমিটচ্য ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম। ম্রো জনগোষ্ঠীর শিশু-কিশোর ও বয়স্কদের নিয়ে ১লা ডিসেম্বর থেকে চলছে এই কার্যক্রম।আলীকদম উপজেলার তিন মৌজায় দুর্গম ক্রাংসিপাড়ায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছেলে-বুড়ো শিখছেন নিজেদের পূর্বপুরুষদের ভাষাটি।

নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রেংমিটচ্য ভাষা বাঁচানোর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন সিংরা ম্রো নামের এক তরুণ। তিনি রেংমিটচ্যভাষী মাংপুন ম্রোর ছেলে। তাঁর বাবা অনর্গল রেংমিটচ্য ভাষায় কথা বলতে পারেন। কিন্তু সিংরা ভাষাটি ভালো জানতেন না। কয়েক বছর হলো শিখেছেন। এখন সেটাই ছড়িয়ে দিতে চাইছেন প্রজন্মান্তরে। শুরু থেকেই সিংরার এই উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন লেখক ও গবেষক ইয়াংঙান ম্রো। গত বছর রেংমিটচ্য ভাষার প্রথম অভিধান লিখেছিলেন তিনি। মূলত 'মিটচ্যতখক' নামের ৩৪০০ শব্দের সেই অভিধানকে ভিত্তি ধরে এখন ভাষাটা শেখানো হচ্ছে।

এছাড়া চা-বাগানে জন্ম নেওয়া দুই চা-শ্রমিকসন্তান আপন ওঁরাং ও মিঠুন ওঁরাং। তারাও নিজেদের বিপন্ন মাতৃভাষা 'কুরুখ' রক্ষায় সংগ্রাম করে চলছেন। মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার দেওড়াছড়া চা-বাগানের বামনবিল টিলায় গত এক বছর ধরে খোলা উঠানে সপ্তাহে প্রতি শুক্র ও শনিবার স্বেচ্ছাশ্রমে ওই দুই তরুণ 'কুরুখ' ভাষা শিখিয়ে আসছেন তাদের সম্প্রদায়ের শিশু-কিশোরদের।

বাংলাদেশে কুরুখ ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নেই। তবে লোকসংগীত, গল্প, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদির চর্চা আছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বামনবিল টিলার লালসাই ওঁরাংয়ের বাড়িতে স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্লাস শুরু হয়। কুরুখ ভাষার গবেষক দীপংকর শীল বলেন, কমলগঞ্জে ওঁরাং জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার। কুরুখ দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের একটি শাখা। ভাষাটি এখন বিপন্ন। অনেকে ভুলতে বসেছে।

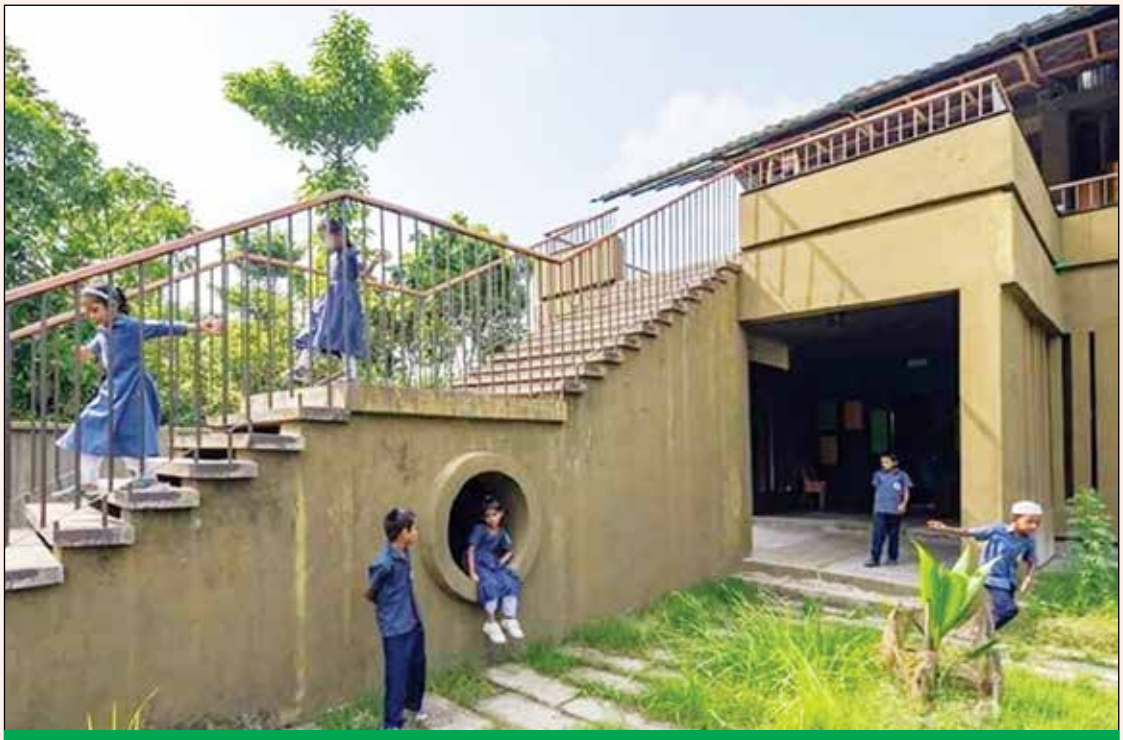

দৃষ্টিনন্দন স্কুল

আতিকুর রহমান

উপরে নীল-সাদা আসমান আর নিচে সবুজ ঘাসে মোড়ানো বির্স্তীণ মাঠ। পাশে মাটি রঙা দোতলা স্কুলঘর। রঙিন ক্লাসরুমগুলো বেশ খোলামেলা। সারাক্ষণই চলে আলো-হাওয়ার খেলা। আহা! কী সুন্দর, মনোমুগ্ধকর দৃশ্য।

চাঁদপুর শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের বহরিয়া বাজারের পাশে অবস্থিত অনন্য শিক্ষাপীঠ শাহাবুদ্দিন স্কুল এন্ড কলেজের চিত্র এটি। স্থাপত্যশৈলীর অবদানে যে বিদ্যালয়টি কয়েক বছর ধরেই চাঁদপুর জেলার দর্শনীয় স্থানের তালিকাতে জায়গা করে নিয়েছে। গুণবিচারেও আলাদা শাহাবুদ্দিন ফাউন্ডেশনের এই বিদ্যাপীঠ। স্থপতি লুৎফুল্লাহিল মজিদ রিয়াজের নকশায় ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শাহাবুদ্দিন ফাউন্ডেশনের এই স্কুলটি।

গ্রামের প্রকৃতির সাথে মিলিয়েই স্কুলঘরের রং করা হয়েছে মাটির রঙে। ঢালাই ছাদের ব্যবস্থা না করে গ্রামীণ আবহ অনুযায়ী টিনের ছাদ দেওয়া হয়েছে। কাঁচের স্লাইডের জানালা ব্যবহার না করে এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী খোলা জানালা রাখা হয়েছে স্কুলঘরে। উত্তর-দক্ষিণমুখী ভবনটিতে তাই আলো বাতাসের কমতি হয় না কখনো। ১১৬ শতাংশ জায়গার ভেতর ৬০০০ বর্গফুট জায়গা জুড়ে স্কুলভবনটি অবস্থিত। নিচতলায় চারটি ক্লাসরুম আর টিচার্সরুম, দোতলায় আছে আরো চারটি ক্লাসরুম। স্কুল মাঠের একপাশে আছে শহিদমিনার।

উপরের তলার ক্লাসরুমে বসে শিক্ষার্থীরা যেন মাটি থেকে নিজেদের খুব একটা দূরে না ভাবে সে চিন্তায় ক্লাসরুমের চারদিকে লাগোয়া প্রশস্ত বারান্দা রাখা

হয়েছে। বারান্দার সিলিং-এর সাথে বাঁশের ঝুড়ির ভেতর বৈদ্যুতিক বাতি ঝুলানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা প্রাকৃতিক আবহের সাথে নান্দনিক দৃশ্যের সৃষ্টি করে।

সিঁড়ি বাচ্চাদের একটা খেলার অনুষঙ্গ। দোতলায় ওঠা-নামার জন্য স্কুল ভবনে রয়েছে দুইটি আলাদা সিঁড়ি। একটি ভবনের ভেতর দিকে, আরেকটি দোতলার এক পাশের করিডোর থেকে সরাসরি নেমে গেছে মাঠের উপর। এই সিঁড়িকে নামকরণ করা হয়েছে ছুটির সিঁড়ি। এই ছুটির সিঁড়ির নিচে গুহার মতো একটা খোলা জায়গা রাখা হয়েছে। সিঁড়ির গায়ে দুইটা রাউন্ড পাঞ্চও আছে। যেখানে ঢুকে বাচ্চারা খেলতে পারবে, স্কুলের পরিবেশ যেন শিশুর বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য স্কুল কম্পাউন্ডের ভেতরে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ লাগানো হয়েছে। আরো আছে ৩০০০ বর্গফুটের একটা মসজিদ। দৃষ্টিনন্দন মসজিদটির সামনের অংশে আছে বৃষ্টির পানি জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা। স্কুলের নকশা থেকে শুরু করে তৈরির সরঞ্জামাদিতে দেশীয় সংস্কৃতি প্রাধান্য পেয়েছে সব ক্ষেত্রেই। কাঠ, বাঁশ আর টিনের ব্যবহার হয়েছে। গ্রামের স্থানীয় মিস্ত্রিদের দিয়ে স্কুল নির্মাণের সব কাজ করানো হয়েছে।

ক্লাস থ্রি থেকে ফাইভ পর্যন্ত প্রতি ক্লাসের জন্যই বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের পর অতিরিক্ত দুই ঘণ্টা বিনামূল্যে কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করেছেন প্রধান শিক্ষক। বেসরকারি হলেও এই স্কুলে পড়াশোনার খরচ নামমাত্র। শাহাবুদ্দিন স্কুলে ভর্তি হতে লাগে ৩৫০ টাকা আর প্রতি মাসের বেতন মাত্র ৫০ টাকা। কোনো মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থী আবেদন করলে বিনা খরচেও পড়ালেখার সুযোগ পায় এখানে।

বাংলাদেশে এমন দৃষ্টিনন্দন বিদ্যাপীঠ কমই আছে। যেখানে রয়েছে প্রকৃতির কাছ থেকে বিদ্যা লাভ করার সুযোগ। আর ব্যতিক্রম পরিবেশে শিক্ষাদান । স্কুলের পরিবেশ নিয়ে যদি সবাই সচেতন থাকে তাহলেই এই নান্দনিক স্থাপনাটি তার সবটুকু সৌন্দর্য নিয়ে অনেকদিন টিকে থাকতে পারবে। ❑

শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

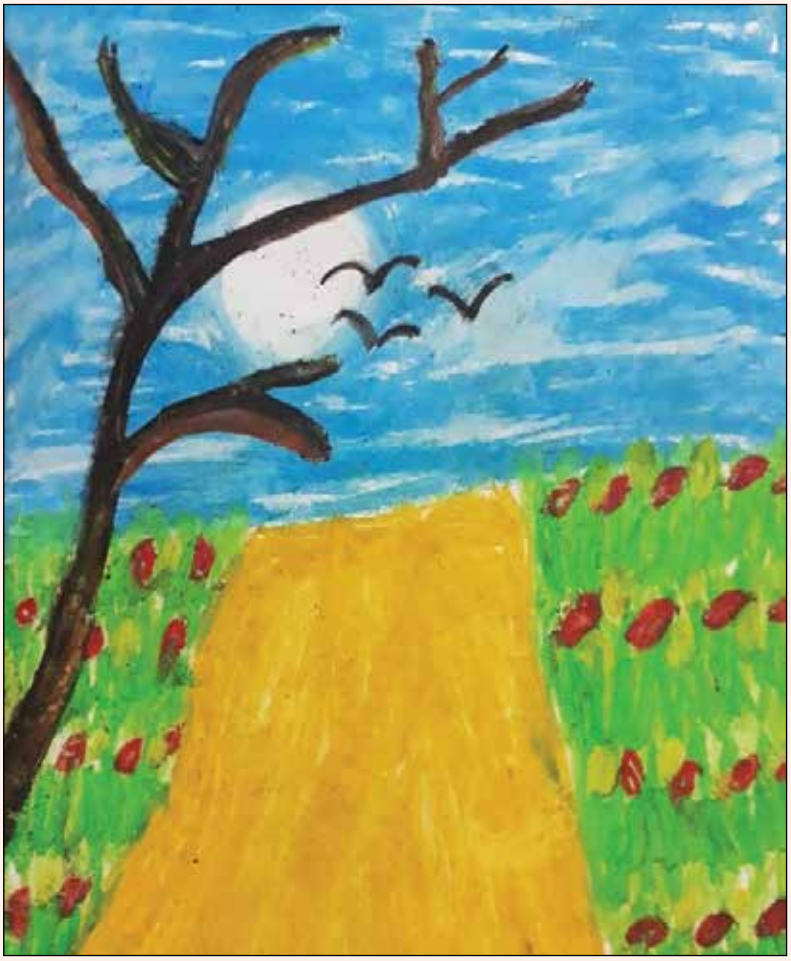

তাসনিম জাহান রাদিয়া, তৃতীয় শ্রেণি, নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, নাটোর

শিশুকে খাওয়ানোর নিয়ম

নবজাতক শিশুর শরীরে জলীয় পদার্থের পরিমাণ কম থাকে। বিশেষত গরমকালে কম দুধ পান করার ফলে শিশুর শরীরের তাপ বেড়ে গেছে বলে ধারণা হতে পারে। বেশিরভাগ নবজাতক জন্মের পরপরই বুকের দুধ পান করতে পারে, তবে যখন কোনো নবজাতক শিশুর দৈহিক বা স্নায়বিক কারণে অসুস্থ থাকে, বা সে মুখে খেতে পারবে কি না এমন সংশয় দেখা দেয়, তখন তাকে খাওয়ানোর জোর চেষ্টা না করে শিশু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

শিশুকে প্রথম খাবার যতটা আগে সম্ভব শুরু করতে গিয়ে তড়িঘড়ি না করাটাই উত্তম বরং মাকে ধৈর্য ও আশ্বাসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। মনে রাখতে হবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই যত আগেভাগে সম্ভব বুকের দুধ পান শুরু করানো উচিত, অন্ততপক্ষে জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে। জন্ম হতে প্রথম ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে শুধু বুকের দুধ খাওয়ানো এবং ছয় মাস বয়স থেকে ঘরে তৈরি পরিপূরক খাবার যেমন : খিচুড়ি শুরু করা যেতে পারে।

শিশুকে দুই বছর বা ততধিক সময় পর্যন্ত সে যখন খেতে চাইবে তখন শিশুকে বুকের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাবার দেওয়া যেতে পারে। প্রথমে অল্প পরিমাণে পরে ধীরে ধীরে তার পরিমাণ বাড়ানোর সঙ্গে মাতৃদুগ্ধ চলবে। ধীরে ধীরে শিশুর খাবারের ঘনত্ব ও পুষ্টিমান বাড়াতে হবে। শিশুকে খাওয়ানোর ক্ষেত্রে উৎসাহ ও ধৈর্য ধরে প্রতিটি পদক্ষেপে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। খাবার তৈরি, খাওয়ানোর আগে, টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান-পানিতে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

অসুস্থ অবস্থায় শিশুকে বেশি বেশি পানীয় ও তরল খাবার খাওয়াতে হবে। অসুখের পর শিশুকে দৈনিক অতিরিক্ত এক বা দুই বেলা বেশি আহার দিতে হবে। শিশুকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী ভিটামিন ও মিনারেল (খনিজ পদার্থ) খাওয়াাতে হবে।

ছয় মাস বয়সের আগে শিশুকে বুকের দুধ অন্য কিছু খাওয়ানো যাবে না। পুরো শিশু বয়সে সুষম পুষ্টি জোগান থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জীবনের প্রথম দু-তিন বছর বয়সে শিশুর গ্রোথ হয় দ্রুতগতিতে। তা ছাড়া এ বয়সের শিশু তার সঠিক খাবার ও খাওয়ানো

নিয়ে পুরোটাই মা-বাবা ও পরিবারের ওপর নির্ভরশীল থাকে। শিশুকে ছয় মাস বয়স পূরণের আগে বুকের দুধ ছাড়া অন্য কিছু খাওয়ানো হলে তার বুকের দুধ খঅওয়ার আগ্রহকে বাধাগ্রস্ত করে। এগুলো শিশুর ছোটো পাকস্থলী আগেভাগে ভরিয়ে রাখে। তার তৃষ্ণা মিটে যায়। শিশুর অন্ত্রনালি এসব অ্যালার্জি ঠেকানোর মতো পরিপক্ব হয়ে ওঠে না। নানা রকম সংক্রামক রোগ ও অপুষ্টিতে ভোগার ঝুঁকিতে থাকে। শিশুর কিডনি এই খাবারের ভার সহ্য করতে পারে না। পরবর্তী জীবনে স্থূলকায় হওয়া, উচ্চ রক্তচাপ ও করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকিতে পড়ে।

ছয় থেকে ১২ মাস বয়সে বুকের দুধ তার পুষ্টি চাহিদার অর্ধেক জোগান দেয়, আর ১২ থেকে ২৪ মাস বয়সে পুষ্টি চাহিদার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সরবরাহ করে। পরিপূরক খাবারের উপাদান : চটকানো কলা, আটা-ময়দা, ভাত, সুজি, সিদ্ধ ফলমূল (মিষ্টিকুমড়া, গাজর, শাক, আলু) টমেটো এসব উপাদান তার জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও আয়রনের চাহিদা পূরণ করে। মাঝে মাঝে শিশুকে মৌসুমি ফলমূল খাওয়ানো যায়।

সাত মাস বয়সে কোনো কোনো শিশু বাড়তি খাবার খেতে চায় না। মা-বাবার উচিত এতে প্যানিক না হয়ে বরং নতুন স্বাদের কোন্ খাবারে তার আগ্রহ আছে তা যাচাই করে দেখতে হবে। কখনো জোর করে খাওয়াতে নেই। যে বয়সে শিশু গ্লাস হতে নিজে নিজে পানি পান করতে পারে, তাকে তাতে উৎসাহ দিতে হবে। শিশুর শাক-সবজি বেশি ফুটানো ভালো নয়। ভাত বা শাকসবজি সিদ্ধ করলে যে পানি থাকে তা ফেলে না দেওয়া উত্তম। ভালোভাবে পরিষ্কার করা তাজা ফল বাচ্চাকে হাতে ধরে খেতে দিলে সে জিভে স্বাদ পায়। বেশিরভাগ শিশু মাঝারি মাত্রার ঝাল সহ্য করতে পারে এবং তা শরীর উপযোগীও।

শিশুকে বোতলজাত খাবার, জুস, কোল্ড ড্রিংকস, পুষ্টি ড্রিংকস এসব না খাওয়ানো ভালো।

সুতরাং শিশুর পাকস্থলীর ধারণক্ষমতা, তার জন্য দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালরি চাহিদা এসবের ওপর ভিত্তি করে শিশুকে তার বয়স অনুযায়ী খাবার দিতে হবে। অনেক মা-বাবা টেলিভিশন দেখিয়ে শিশুকে খাওয়াতে থাকেন কিন্তু এটা একদমই ঠিকনা। এতে শিশু খাবারের মনোযোগের চেয়ে টেলিভিশনে মনোযোগ বেশি থাকে। শিশুকে সঠিকভাবে খাওয়াতে গেলে বিশেষ করে এক বছরের কম বয়সি শিশুকে ঠিকমতো খাওয়ানোর জন্য মা ও শিশুর মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ বজায় থাকা অপরিহার্য। যার শুরু আনকোরা অভিজ্ঞতা দিয়ে, অথচ শিশু নিজে নিজে খেতে না শেখা পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করতে হয়। শিশুকে খাওয়ানোর কাজ যখন সুস্থ ও তৃপ্তিকর হয়ে ওঠে, তা মা ও শিশুর মনেও স্বস্তি আনে।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

পিলার তো নয় যেন ক্যানভাস

ইট-পাথরের শহরে মানুষের মন রাঙিয়ে দিতে মহাখালী ফ্লাইওভারে নানা রঙের শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তুলছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন।

রাজধানীর মগবাজার থেকে সাতরাস্তামুখী ফ্লাইওভারের নিচের পিলারগুলোতে নেই কোনো ব্যানার-পোস্টার। এমন একটা সময় ছিল যখন ব্যানার-পোস্টারের আড়ালে ফ্লাইওভারের পিলারই যেন দেখা যেত না। সেই পিলারগুলোই গত কয়েক মাসে হয়ে উঠেছে বর্ণিল ক্যানভাস। তাতে ফুটে উঠছে চোখ-জুড়ানো গ্রাফিতি। এখানে শোভা পেয়েছে দেশীয় সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ ও শিক্ষণীয় বিষয়।

কোনো পিলারের শিল্পকর্মে দেখা যাচ্ছে এক কিশোর চারাগাছ লাগাচ্ছে তো আরেকটি শিশু বই নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। কোনোটিতে লেখা 'হর্ন বাজাবেন না' বা 'পোস্টার না লাগাই'। এ ছাড়া বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দেওয়া ক্রিকেটের সাফল্য এমন অনেক কিছু ঠাঁই পেয়েছে গ্রাফিতির আর্টের মাধ্যমে।

গত বছর এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় সিটি করপোরেশন নিজস্ব উদ্যোগে মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের পিলারে গ্রাফিতি এঁকে নজর কাড়ে। এতে যুক্ত করা হয় রিকশা পেইন্টিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত কয়েকজন সুদক্ষ শিল্পীকে। বিষয়টি প্রশংসিত হওয়ায় সিটি করপোরেশনের সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের খরচে এই উদ্যোগ এগিয়ে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এর সাথে যুক্ত হয় জার্মান দূতাবাস।

ইউরোপীয় দূতাবাস নিজস্ব অর্থে শিল্পকর্ম করিয়েছে। মহাখালী ফ্লাইওভারের দেয়াল ও পিলারে আঁকা হয়েছে রং-বেরঙের পাখি, গাছ, ফুলের চিত্র। গ্রামবাংলার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। রঙিন হয়ে উঠেছে রাজধানীর অন্যতম ব্যস্ততম এলাকাটির ফ্লাইওভারের দেয়াল ও পিলার। ফ্লাইওভারেও এমন কিছু হতে পারে, তা আমাদের ভাবনায়ই ছিল না।

সাধারণত নির্বাচনের সময় গ্রাম-শহরসহ সব জনপদ নির্বাচনী পোস্টারে ছেয়ে যায়। কিন্তু দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়ও রাজধানীর মগবাজার-মৌচাক, মহাখালীতে ফ্লাইওভারের নিচে শিল্পকর্ম থাকা স্থানগুলোতে কেউই পোস্টার লাগায়নি। নগর বিশেষজ্ঞরা তাই মনে করছেন, উদ্যোগ নিয়ে নগরের বিভিন্ন স্থানকে যদি সুন্দর রাখা যায় তবে অসচেতন মানুষও সচেতন হয়ে যায়।

শুরুতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের তত্ত্বাবধানে পোস্টার-ব্যানারে ভরা অসুন্দর পিলারগুলোকে দৃষ্টিনন্দন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এখন গ্রাফিতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিভিন্ন স্পন্সর এমনকি বিদেশি দূতাবাসও আগ্রহ প্রকাশ করছে।'

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

মগবাজার ফ্লাইওভারের এফডিসির সামনের একটি পিলারে

নারী ফুটবলে যৌথ চ্যাম্পিয়ন

সব আলোচনার অবসান ঘটিয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনালের চূড়ান্ত ফল বাংলাদেশ-ভারত যৌথ চ্যাম্পিয়ন। ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা সময়ে চার মিনিটের তৃতীয় মিনিটেও বাংলাদেশ এক গোলে পিছিয়ে ছিল। সাগরিকার নাটকীয় গোলে ম্যাচে ফেরে স্বাগতিক বাংলাদেশ। প্রাণ ফেরে কমলাপুর স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে। রুদ্ধশ্বাস সেই মুহূর্তটা পেরিয়ে টাইব্রেকারে দুই দলই নিজেদের প্রথম ১১ শটে গোল করেছে।

৮ মিনিটে করা শিবানীর গোলে এগিয়ে যাওয়া, যোগ করা সময় পর্যন্ত সেটা ধরে রেখেও টাইব্রেকারে যাওয়া, টাইব্রেকারে শুরু থেকেই বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে থেকে চাপের মধ্যে শট নেওয়া-সেই রুদ্ধশ্বাস অবস্থা থেকে টসের মাধ্যমে যেন মুক্তি পেয়েছে ভারতের মেয়েরা। কিন্তু ম্যাচ কমিশনারের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ মানেনি। তীব্র প্রতিবাদ জানায় বাংলাদেশ দল। আর এতে ম্যাচে তৈরি হয় দীর্ঘ অচলাবস্থা।

কমলাপুর স্টেডিয়ামে এর আগে সাফ বয়সভিত্তিক ফুটবলে তিনটি ফাইনাল খেলে সবকটিই জিতেছে বাংলাদেশ। অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে ২০২১ সালে ভারতকে হারিয়েই শিরোপা জয় করে ঘরের মেয়েরা। এই মাঠেই অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে ২০১৭ সালে নেপালকে ১-০ গোলে হারায়। গত বছর অনূর্ধ্ব-২০ বিভাগে ফাইনালে জেতে নেপালকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে। আজ সেই জয়ের রেকর্ড ধরে রেখেছে বাংলাদেশ।

ভারতের মেয়েরাই ৮ মিনিটে এগিয়ে যায়। রক্ষণ দুর্বলতায় স্বাগতিকেরা পিছিয়ে পড়ে। ভারতীয় মিডফিল্ডার নিতু লিন্ডার থ্রু বল বাংলাদেশের দুই ডিফেন্ডারকে পেছনে ফেলেছে, বল পান লেফট উইঙ্গার শিবানী দেবী। বাংলাদেশের গোলরক্ষক স্বর্ণা রানী পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে বক্সের সামনে এসেও বলের নাগাল পাননি। শিবানীর বুদ্ধিদীপ্ত প্লেসিংয়ে বল চলে যায় জালে। অবশেষে হাসিমুখ নিয়েই বাংলাদেশের মেয়েরা মাঠ ছাড়ে।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

এভারেস্টের বেজক্যাম্পে শিশু

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু পর্বত মাউন্ট এভারেস্টের ১৭ হাজার ৫৯৮ ফুট উঁচুতে অবস্থিত বেজক্যাম্পে পৌঁছে বিশ্বরেকর্ড গড়েছে মাত্র চার বছর বয়সের এক কন্যাশিশু। ১৬ই জানুয়ারি সংবাদ মাধ্যমে এ রেকর্ডের খবর প্রকাশিত হয়।

নবারুণের ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা তো নিশ্চয়ই অনেকেই ইতোমধ্যে এই দুঃসাহসী মেয়ের নাম জেনেছ। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি জারা জেডের কথা বলছি। এভারেস্টের বেজক্যাম্পে উঠে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে রেকর্ড গড়েছে সে। এ সময় জারার সাথে ছিল তার বাবা ডেভিড সিফরা ও সাত বছর বয়সি তার বড়ো ভাই সাশা জেড।

সংবামাধ্যম দ্য মেট্রোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এভারেস্টের বেজক্যাম্প পর্যন্ত যেতে ১৭০ মাইল পথ সফর করতে হয়েছে জারাকে। এর আগে সবচেয়ে কম সময়ে বেজক্যাম্পে ওঠার রেকর্ড ছিল প্রিসা লোকেশ নিকাজোর। ২০২৩ সালে এ রেকর্ড গড়ার সময় তার বয়স ছিল পাঁচ বছর। কিন্তু জারা চার বছর পাঁচ মাস বয়সেই বেজক্যাম্পে উঠে এ রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। তাদের এ অভিযানে নানারকম বাধা ছিল। বেজক্যাম্পের তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

চেক রিপাবলিক ও কানাডার যৌথ নাগরিক হলেও জারার জন্ম ও বেড়ে ওঠা মালয়েশিয়ায়। সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাদের পরিবার।

তার পরিবার থেকে বলা হয়, ছোটো থেকেই জারা প্রতিদিন ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার হাঁটে ও ৩০০ থেকে ৬০০ মিটার উঁচুতে ওঠে। ২০২৩ সালেই সে জঙ্গলে ২ হাজার ২০০ কিলোমিটার হেঁটেছে।

ইনস্টাগ্রাম পোস্টে সাশা বলেছে, 'ছোট্ট জারা গরম পানিতে স্নান করতে পছন্দ করে না; বরং স্নানের সময় ঠান্ডা পানির সঙ্গে তার বরফ কিউব চাই। তার শারীরিক অবস্থা খুবই ভালো, এমনকি আমাদের দলের অন্যান্য ট্র্যাকারের চেয়েও ভালো। এই ঠান্ডায় তার কোনো সমস্যা হয়নি'।

জানা গেছে, ৪ বছর ৫ মাস বয়সি জারা ৩টি ভাষায় কথা বলতে পারে চেক, চীনা এবং ইংরেজি।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

ভাত খেয়ে বিশ্বরেকর্ড

আবারও বিশ্বরেকর্ড করলেন বাংলাদেশের নুসরাত জাহান নিপা। এবার তিনি চপস্টিক দিয়ে একেকবারে মাত্র একটি করে তুলে এক মিনিটেই ২৭টি ভাতের দানা খেয়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড বুকে নাম লেখালেন। চপস্টিক হচ্ছে চীনাদের ব্যবহৃত ভাত খাওয়ার সরু কাঠি। ইটালির এক নাগরিকের করা রেকর্ড ৮ বছর পর ভেঙেছেন নিপা। এর আগে প্রথমবার এক মিনিটে ৭১টি কয়েন দিয়ে টাওয়ার তৈরি করে রেকর্ড করেছিলেন। বাংলাদেশ থেকে নারী হিসেবে পর পর দুই বার বিশ্বরেকর্ড করেছেন নিপা।

এর আগে এক মিনিটে ২৫টি ভাত খেয়ে ইতালির এক নাগরিক গিনেস ওয়ার্ল্ড বুকে রেকর্ড করেছিলেন। সেই রেকর্ডটি নিপা ভেঙেছে। ২০২৩ সালের মার্চের দিকে এ রেকর্ড করলেও যাচাই-বাছাই শেষে সম্প্রতি সার্টিফিকেট পেয়েছে। ২০২২ সালে এক মিনিটে ৭১টি কয়েন দিয়ে টাওয়ার তৈরি করে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন নিপা। তখনও ইতালিকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ এবং এবারও ইতালির রেকর্ড ভাঙা হয়েছে। কয়েন দিয়ে বিশ্বরেকর্ডের থেকে চপস্টিক দিয়ে বিশ্বরেকর্ড করাটা বেশ কঠিন ছিল। অনেক প্র্যাকটিসও করতে হয়েছে। তবে এবারে সার্টিফিকেট পেতে অনেকটা সময় লেগেছে।

স্বীকৃতি নিশ্চিত করে সম্প্রতি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের বরিশালের নুসরাত জাহান নিপা ২০২২ সালের ২রা সেপ্টেম্বর চপস্টিক নিয়ে ২৭টি ভাতের দানা খাওয়ার কৃতিত্ব গড়েছেন। একই বছর এপ্রিলে এক মিনিটে ২৭টি ভাতের দানা খেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক টেলান্ড লা পৃথকভাবে গিনেস বুকে ঠাঁই পান। এর আগে ২০১৮ সালে ইতালির সিলভিও সাবা চপস্টিক ব্যবহার করে এক মিনিটে খেয়েছিলেন ২৫টি দানা।

বরিশালের মেয়ে নিপা জানান, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সবকিছু অর্জন করা সম্ভব। ঘরে বসেই দেশ ও আমার শহর বরিশালকে বিশ্বের বুকে তুলে ধরতে এ রেকর্ড করেছি। ইউটিউব দেখে কয়েন দিয়ে টাওয়ার গড়া, অতি দ্রুত ভাতের দানা খাওয়াসহ নানারকম বিচিত্র বিষয়ে জানতে পেরেছেন তিনি। করোনাকালে ঘরবন্দি জীবনে নতুন কিছু করার আগ্রহ থেকে তিনি এগুলোর চর্চা শুরু করেন। নিপা আরো জানান, 'কয়েন দিয়ে টাওয়ার তৈরি করার চেয়ে চপস্টিক দিয়ে ভাতের দানা খেয়ে রেকর্ড করাটা বেশি কঠিন ছিল। এজন্য অনেক চর্চা করতে হয়েছে। সামনে নতুন কিছু করার চেষ্টা করব। এভাবে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে চাই । নিপা বরিশাল নগরীর এআরএস স্কুল থেকে মাধ্যমিক, সরকারি মহিলা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছেন। এরপর বরিশালের সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ থেকে রসায়ন বিভাগে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন।

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

ভ্যান গাড়িতে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার

তিন চাকার একটি ভ্যান। সেখানে হালকা সবুজ রঙের সুন্দর একটি ছাউনি। তার ভেতরে থরে থরে সাজানো বিভিন্ন রকমের বই। বই নিয়ে ভ্যানটি যাচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। টিফিনের সময় শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে বই নিয়ে পড়ছে। টিফিন শেষ হবার আগেই আবার বইগুলো ভ্যানে রেখে ক্লাসে যাচ্ছে তারা। এমনই এক ব্যতিক্রমী ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের দেখা মিলেছে পাবনার বেড়া উপজেলায়।

ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে 'ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার।' বেড়া উপজেলার বেড়া পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীরা টিফিনের সময় তাদের ইচ্ছেমতো ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার থেকে বই নিয়ে দাঁড়িয়ে বা ভবনের বারান্দায় বসে বসে পড়ে। শিক্ষার্থীরা খাতায় নাম-ঠিকানা লিখে বই বাড়িতে নিয়ে পড়ার সুযোগ পায়। ভ্যানটির উপরের ছাউনিতে লেখা পাঠাগারের স্বার্থকতা হাসপাতালের চাইতেও কম নয়। 'নিজে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন, অন্যকে বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।' বেড়া উপজেলার 'শিক্ষার্থী সহযোগিতা সংগঠন' নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের উদ্যোক্তা। মুলত শিক্ষার্থীদের মাদকের নেশা, মোবাইল গেমিংসহ বিভিন্ন অপসংস্কৃতি ও ভার্চুয়াল জগত থেকে দূরে রেখে বই পড়ার অভ্যেস গড়ে তুলতে তাদের এই উদ্যোগ।

ভ্যানটিতে গল্প, উপন্যাস, ছোটো গল্প, ইসলামিক, শিশুতোষ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীসহ বিভিন্ন বই রয়েছে। পাঠাগারটি সাতদিন করে উপজেলার একটি স্কুলে থাকবে এবং সেখানকার শিক্ষার্থীরাই তার দায়িত্বে থাকবে। প্রথমে ৭শ' বই নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে বই এর সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। শিক্ষার্থী সহযোগিতা সংগঠন ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রতিবেদন : আরিফুল ইসলাম

বিশ্বের বৃহত্তম প্রমোদতরী

যাত্রা শুরু হলো দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো প্রমোদতরীর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য মায়ামি বন্দর থেকে শুরু হয় এর যাত্রা । প্রমোদতরীর নাম 'আইকন অব দ্য সিজ'। স্থানীয় সময় ২৭শে জানুয়ারি সূর্যাস্তের আগে প্রথম যাত্রা করে এটি। এখানে রয়েছে বিনোদনের বিশাল জগত। টাইটানিকের চেয়ে পাঁচ গুণ বড়ো এই প্রমোদতরী। তাই অনেকেই এটিকে মায়ানগরী বলছেন। বিশালতা, চাকচিক্য, বিনোদনের সম্ভার ও সুপরিসর এই প্রমোদতরী ভ্রমণপিপাসুদের দৃষ্টি কেড়েছে। ক্রুজ জাহাজটিতে রয়েছে ২০টি ডেক, ৭টি সুইমিং পুল, ৬টি ওয়াটার স্লাইড। এটির সবচেয়ে উপরের ডেকে আছে ৪০টিরও বেশি বার, রেস্তোঁরা, লাউঞ্জ এবং

বিনোদনস্থল। বিশাল এই তরীতে একসঙ্গে থাকতে পারবেন ৭ হাজার ৬০০ জন যাত্রী। ২ হাজার ৩৫০ জন ক্রুর জন্য আলাদা থাকার বন্দোবস্ত রয়েছে। রয়্যাল ক্যারিবিয়ান গ্রুপের মালিকানাধীন এই প্রমোদতরীর সামনের দিকে আছে 'অ্যাকোয়াডোম'। সেখানে জলপ্রপাতও দেখা যাবে। আর ৭০ শতাংশ কক্ষের সঙ্গে আছে বারান্দা। যেখানে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করা যাবে। যাত্রীদের বিনোদন দেওয়ার জন্য ৫০জন সঙ্গীতশিল্পী এবং কমেডিয়ানও আছে এই তরীতে। আইকন অব দ্য সিজ-এর দৈর্ঘ্য ৩৬৫ মিটার (১ হাজার ১৯৭ ফুট)। এর ওজন ২ লাখ ৫০ হাজার ৮০০ টন। 'থ্রিল আইল্যান্ড'-নামে বিশালাকার ওয়াটার পার্কও আছে প্রমোদতরীটিতে। 'সার্ফসাইড' নামে একটি পারিবারিক এলাকা আছে। এতদিন বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো প্রমোদতরী ছিল রয়্যাল ক্যারিবিয়ানের 'ওয়ান্ডার অফ দ্য সিজ'। সেটিকে পেছনে ফেলে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো প্রমোদতরী হলো 'আইকন অব দ্য সিজ'। জাহাজটি বানাতে খরচ হয়েছে ২০০ কোটি ডলার।

যমজ শিশুদের বিদ্যালয়

স্কটল্যান্ডের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। যেখানে ভর্তি হয়েছে ১৭ জোড়া যমজ শিশু! স্কটিশ কাউন্সিলের ইনভারক্লাইড এলাকায় রয়েছে বিদ্যালয়টি। যমজ সন্তান স্কুলে ভর্তির কারণে স্কটল্যান্ডের ইনভারক্লাইড এলাকাটি ইতিমধ্যেই 'টুইনভারক্লাইড' নামে পরিচিত। স্কুলটিতে ২০১৩ সালে প্রথম ১৯ জোড়া যমজ শিশু ভর্তি হয়। এরপর প্রতি বছর যমজ শিশু ভর্তির দিক দিয়ে স্কুলটিতে রেকর্ড হতে থাকে। এখন পর্যন্ত স্কুলটিতে ১৪৭ জোড়া যমজ শিশু ভর্তি হয়েছে! আর প্রতি বছর গড়ে ১৩ জোড়া যমজ শিশু ভর্তি হয় এই স্কুলে। গত বছর ভর্তি হওয়া যমজ শিশুদের বেশির ভাগই স্কুল শুরুর আগে পোশাক মহড়ার জন্য গ্রিনকের সেন্ট প্যাট্রিক প্রাইমারি স্কুলে সমবেত হয়েছিল। ইনভারক্লাইড কাউন্সিলের ডেপুটি প্রভোস্ট গ্রায়েম ব্রুকস বলেন, 'যমজ সন্তানদের প্রাইমারিতে স্বাগত জানানোর জন্য ইনভারক্লাইড বা টুইনভারক্লাইডে এটি একটি বার্ষিক ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে। আগামী সপ্তাহে নতুন ক্লাস শুরু করার জন্য আমরা প্রস্তুত। এই শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে স্কুলের পোশাক পরা অবস্থায় দেখার জন্য এর চেয়ে আর ভালো উপায় আর কী হতে পারে। এটি অভিভাবকদের জন্যও আনন্দের।'

সন্তানের নাম সুরে সুরে

পৃথিবীতে এমন এক গ্রাম আছে যেখানে কোনো শিশু জন্ম নিলে তার নাম রাখা হয় না। বরং ডাকা হয় সুরে সুরে! কি অবাক করা খবর তাই না! গ্রামটি ভারতের মেঘালয়ে অবস্থিত, যার নাম কংথং। বিবিসির প্রতিবেদনে জানা যায়, কংথং গ্রামে শিশুর নামের পরিবর্তে সুর তৈরি করেন মায়েরা। নামে নয় সুরেই শিশুর পরিচিতি হয়। শুধু মায়েরা নন, সন্তানদের বাবা কিংবা স্বজনেরাও এই সুরে ডাকতে পারেন তাদের। তবে সুর তৈরি করার অধিকার শুধু মায়েদেরই থাকে। এরপর সেই সুর অনুযায়ী সন্তানকে ডাকা হয়। সাধারণত সুরগুলো কিছুটা ছোটো হয়। আবার কিছু সুর হয় লম্বা ধরনের। কংথংয়ের জঙ্গলেও প্রায়ই গানের সুরে শিষ অথবা কিচিরমিচির শব্দ শোনা যায়, যা ব্যবহার করা হয় কাউকে ডাকার জন্য। অবাক করা বিষয় হলো গ্রামের কেউই নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না এই রীতি কবে, কখন এবং কীভাবে শুরু হয়েছে। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম এটি। গান গাওয়ার এই নিয়মকে বলা হয় 'জিংরাই আওবি' বা বংশের প্রথম মায়ের গান। এই গ্রামে মূলত খাসিয়া জনগোষ্ঠীর বাস। ভারতের এই জনগোষ্ঠীটি মাতৃতান্ত্রিক। ইউনেস্কো কংথং গ্রামকে বেস্ট ট্যুরিজম ভিলেজ হিসেবেও স্বীকৃতি দিয়েছে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. স্থানীয় সরকারের একটি অংশ, ৩. চুক্তির নিয়ম, ৪.বিপদ-আপদ, ৭.সিংহের ঘাড়ের লোম, ৮. মূল্য নির্ধারণ করা, ১১. সমান

উপর-নিচ:

১.বৃহৎ গ্রহের চারপাশে পরিক্রমণরত ক্ষুদ্র গ্রহ, ২. ক্ষত-বিক্ষত, ৩. মিষ্ট শীতল পানীয়, ৫. কৃত্রিম মুখ, ৬. ছায়া আকৃতির দেহ, ৯. একটি সংখ্যা, ১০. ওজনের একক

				■	■		
	■		■	■	■		■
	■						
	■		■		■		■
■		■	৭			■	■
■		■	■	■	■	■	■
■	৮.			৯.	■	■	১০.
■		■	■		■	১১.	

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতই এক ধরনের ধাঁধাঁ ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেয়া হল।

সংকেত: অসমাপিকা ক্রিয়া, এপিটাফ, অসৎ, পিটপিট, আগুয়ান, নর, সাগরিকা, গুণ, প্রসার

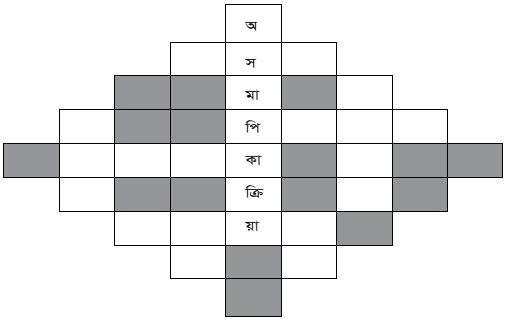

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। 1-81 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

		২৩	৩০			৪৩		৪৫
২০							৫১	
	২৬	২৭			৪০	৫৩	৫০	
১৮		১৬		৩৪				৪৮
	১২		৩৬		৩৮	৫৫	৫৬	
		১৪		৭৪		৭৬		৫৮
৯			৭২	৮১		৭৭	৬০	
	৩	৬			৭৯		৬৫	
১			৭০			৬৭		৬৩

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৮	*		-	৭	=	
/	■	*	■	-	■	+
	/	১	+		=	৬
+	■	+	■	/	■	-
১	*		-	১	=	
=	■	=	■	=	■	=
	+	৫	+		=	১৩

জানুয়ারি মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

উ	প	জে	লা			শ	র্ত
প		র				র	
গ্র		বা	লা	মু	সি	ব	ত
হ		র		খো		ত	
	ছা		কে	শ	র		
	য়া						
	মূ	ল্যা	য়	ন			গ্রা
	র্তি			য়		স	ম

ছক মিলাও

				অ				
			অ	স	ৎ			
				মা		এ		
	প্র			পি	ট	পি	ট	
	সা	গ	রি	কা		টা		
	র			ক্রি		ফ		
		আ	গু	য়া	ন			
			ণ		র			

ব্রেইন ইকুয়েশন

৮	*	২	-	৭	=	৯
/		*		-		+
৪	/	১	+	২	=	৬
+		+		/		-
১	*	৩	-	১	=	২
=		=		=		=
৩	+	৫	+	৫	=	১৩

নাম্বিক্স

২১	২২	২৩	৩০	৩১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫
২০	২৫	২৪	২৯	৩২	৪১	৫২	৫১	৪৬
১৯	২৬	২৭	২৮	৩৩	৪০	৫৩	৫০	৪৭
১৮	১৭	১৬	৩৫	৩৪	৩৯	৫৪	৪৯	৪৮
১১	১২	১৫	৩৬	৩৭	৩৮	৫৫	৫৬	৫৭
১০	১৩	১৪	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৫৯	৫৮
৯	৮	৭	৭২	৮১	৭৮	৭৭	৬০	৬১
২	৩	৬	৭১	৮০	৭৯	৬৬	৬৫	৬২
১	৪	৫	৭০	৬৯	৬৮	৬৭	৬৪	৬৩

m¤§vbx MÖnYi weÁwß

আগামীতে লেখক সম্মানী ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এজন্য সম্মানিত লেখকগণকে লেখার সাথে ব্যাংক একাউন্টের নাম, হিসাব নম্বর, ব্যাংকের নাম ও শাখা এবং রাউটিং নম্বর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। শিশুদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে হিসাব নম্বর চালু করার অনুরোধ করা হলো।

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

জুনাইরা জাহিন, কেজি শ্রেণী, বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা

জারিন আক্তার, কেজি শ্রেণি, রোজবাড কিন্ডার গার্টেন স্কুল, বারহাট্টা, নেত্রকোণা

উপমা দও তরী, চতুর্থ শ্রেণি, বটমলী হোম অর্ফানেস, ঢাকা

স্নেহা চৌধুরী, অষ্টম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-48, No-08. February 2024, Tk-20.00

Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

তথ্য ভবন

১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা